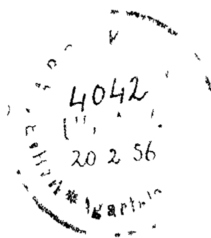


উত্তরাপথ

সমর গুহ



এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা—১২

প্রকাশ করেছেন
বীথি হালদার
১৫ বি চুনাপুকুর লেন
কলিকাতা—১২

ছেপেছেন
এক থেকে একশো বার পাতা
সোমনাথ বন্দোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা

একশো তের থেকে শেষটুকু
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা

বেঁধেছেন
স্বস্তিকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
রবীন মণ্ডল

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬২

মূল্য—তিন টাকা মাত্র

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
১৬।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

যার ভালো লাগবে

শিলামন্থনের অনন্ত তরঙ্গ : ঘন নীল সমান্তরালে বিলম্বিত হয়ে গেছে উত্তর আকাশে। নিচে জল। সপ্ত ধারায় নেমে আসছে সমতল ভূমিতে। তারপর বিস্তীর্ণ হয়ে ছুটে চলছে দুরন্ত প্রবাহে।

হিমালয়নিঃসৃত গঙ্গা,—ভারত-ইতিহাসের চিরন্তনী প্রাণধারা!

হরিদ্বারে আসার দুদিন আগেও ভাবিনি এ-পথের কথা। উন্মনা মনটাকে উধাও করে দিয়ে ক্ষণিকের জন্য শূন্যতার আস্বাদ পাব তাই বেরিয়েছিলাম কলকাতা থেকে। যেদিকে খুশী চলো। সে-চলা আকস্মিক শুরু হলো এসে হিমালয়ের দ্বারে। হরিদ্বারে।

উত্তর সীমানায় হাজার মাইল জুড়ে সমান্তরাল হয়ে আছে হিমালয়। তবু হরিদ্বারই হিমালয়ের দুয়ার। ইতিহাসের এই উপসংহার।

এ দুয়ার দিয়ে গঙ্গা নামছে। তারই পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে একটি বিসার্পিল পথ। হিমালয়ের বুকে যাওয়ার যুগ-যুগান্তের ঐতিহাসিক সরণী।

মহারাজদের কথায় একটু যেন নিরুৎসাহ : একলা তো এপথে কেউ যায় না। অসুখ হতে পারে। রান্নাবাড়া আছে। পথ চলতে চলতে মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠতে পারে। কথা বলবারও তো এক-আধটা লোক চাই!

চোর-ডাকাত বা জন্তু-জানোয়ার তো আর নেই এ পথে কিছুটা খুঁতখুঁতি নিয়ে জিজ্ঞেস করি।

অত কি আর ভাববার! কত সাধু একলা যায় আসে: জ্ঞা মহারাজের কণ্ঠে সমর্থন পাওয়া গেলো।

কুলী নেবেন তো?—তা-ও না? ঠিক আছে। চলে চলতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আবার আশ্বাস দিলেন তিনি।

বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে মনটা ভ্রূক্ষেপহী হয়ে উঠলো। ক্যায়া পরোয়া! থাক না বর্ষা! নাই বা গে এ সময়ে যাত্রী! একলাই চল! অত আগু-পিছু কি।

হিমালয়ের কালো-নীল তরঙ্গে মনের স্পন্দনটা যেন আরে নিবিড় হয়ে উঠলো। কালই রওনা হবো। বর্ষা বা সহযাত্রী জন্য আর অপেক্ষা নয়।

দুটো কম্বলের ঝোলা আর একটা হালকা ব্যাগ ঘাড়ে ঝুলা মাসের বর্ষা মাথায় নিয়েই এসে পৌঁছলাম হৃষীকেশে জামাকাপড় বাকী সব পড়ে রইলো হরিদ্বারের রামকৃষ্ণ মিশনে।

তুলসীমঠ চিনে নিতে বেশি দেরী হলো না। হৃষীকেশে এক কোণায় একটা একতলা বাড়ী। গাছপালা আছে সামনে দুয়ারে তালা দেওয়া। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই যতীন মহারা এসে গেলেন।

জ্ঞান মহারাজ চিঠি দিয়েছিলেন পরিচয় দিয়ে।

যাত্রীদের গুছিয়ে দিতে যতীন মহারাজেরও খুব উৎসাহ জ্ঞান মহারাজের মত তিনিও বহুবার অলকনন্দা-মন্দাকিনী তীরে তীরে যাতায়াত করেছেন। সতপন্থেও গিয়েছেন। স

নখাগ্রে। ঘরে বসতে বসতেই কি কি নেওয়া-না-নেওয়া তার ফর্দ ঠিক করে ফেললেন।

লাঠি এনেছেন তো! ক্যাম্বিসের জুতো? ছাতা আনেন নি? সেকি মশাই? শুধু ওয়াটারপ্রুফে তো চলবে না! ছাতা চাই যে!

আশ্রমে সন্ধ্যা দিয়ে শহরে নিয়ে চললেন। হৃষীকেশ শহর, মানে গঙ্গার পারে সাধুদের সহস্র আশ্রম আর ধর্মশালা। কিছু বানপ্রস্থীদের ঘরও আছে। পথে-ঘাটে সর্বত্রই গেরুয়া,—'পন্থী চিহ্নের' যা এক-আধটুকু বৈচিত্র্য মাত্র। হরিদ্বারে শুরু হলেও হৃষীকেশেই হিমালয়ের যথার্থ সূচনা। এখান থেকেই পাহাড়ী চড়াইয়ের আরম্ভ। হিমালয়-যাত্রীরা যাওয়া-আসার সময় এখানকার ধর্মশালায় বিশ্রাম নেন। পাহাড়ে ওঠার পথে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনেন।

দামী ছাতা কেনার কোন দরকার নেই। এটা তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। কেউ না কেউ ফেরার পথে নিয়ে নেবেই।

টর্চের আরো একজোড়া একস্ট্রা ব্যাটারী সঙ্গে নিন। না, না, মোম, দেশলাইও নিতে হবে। কিছু শুকনো ফল নিন। কিসমিস, পেস্তা, বাদামও নিন কিছু।

দেখবেন তখন। চলতে চলতে তেতে উঠবেন। তখন এই এক একটা কিসমিসই মনে হবে যেন অমৃত। কিছু লজেঞ্চসও নিয়ে নিন। নিজেও খাবেন, পথে পাহাড়ী ছেলেমেয়েদেরও দেবেন।

কনখল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরা স্বাস্থ্যের দিকটা পাকা করে দিয়েছিলেন। বিষাক্ত পাথরে পা কেটে যেতে পারে তাই সিবা, আইডিন, তুলা ও কিছু এ্যান্টেরোভাইওফর্ম আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেটও সঙ্গে দিয়েছিলেন। জ্বর আমাশয়ও

তো হতে পারে পথে! যতীন মহারাজ যাত্রা সহজের বাকী দিকটা পুরো করে দিলেন।

প্রস্তুতিটা যেন একটু বেশি বেশি মনে হলো। তবু পাকা গাইডদের কথা মেনে নেওয়াই ভালো।

ভারতমন্দির আর গঙ্গার ঘাট দেখে ফিরবার পথে হোটেলে খেয়ে মঠে এলাম। কন্‌খল মিশনে মহারাজরা যত্ন করে খাইয়েছিলেন। কিন্তু তুলসীমঠের সন্ন্যাসীদের আহার হয় 'ভিক্ষান্নে। সকালবেলা ধর্মশালা থেকে 'ভিক্ষা' নিয়ে আসেন। রাত্রে একটু দুধ কি চা। তুলসীমঠ মিশন নয়। এখানে নিভৃতে জপতপ করার জন্য আসেন মিশনের সন্ন্যাসীরা।

অন্ন দিতে না পারলেও অন্য যত্ন কম করলেন না যতীন মহারাজ। ঘুমাবার আগে অনেক পরামর্শ দিলেন: দিনে দশ বারো মাইলের বেশি হাঁটবেন না। সূর্য ওঠার আগেই চলতে শুরু করবেন। দুপুরে জিরিয়ে নেবেন চটিতে। আবার বিকেলে চলবেন। চটি পাবেন দু'পাঁচ মাইল দূরে দূরেই। কালীকমলী-ওয়ালার চটিই ভাল। দূরে ডাকবাংলোও আছে। সরকারী পত্র ছাড়া থাকতে দেয় না ওখানে। যেখানে সেখানে ঝরনার জল খাবেন না কিন্তু। পরিষ্কার 'নালা' দেখে খাবেন।

উঠুন! উঠুন! যতীন মহারাজের তাড়া।

মুষলধারা বৃষ্টি মাথায় করে সাত সকালেই বসলাম গিয়ে মোটরে।

হৃষীকেশ থেকে মোটর যায় রুদ্রপ্রয়াগ অবধি। একশো তিন মাইল। পথে পড়বে দেবপ্রয়াগ, কীর্তিনগর ও গাড়োয়াল শ্রীনগর। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে হাঁটা শুরু। বদ্রীনাথ ছাড়িয়ে আরও

দূরে সত্‌পন্থ। একটু ঘোরা-পথে কেদারনাথ ও তুঙনাথও পড়ে। সব ঘুরে আবার এসে মোটরের পথ ধরতে হাঁটতে হবে প্রায় তিনশো মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত মোটর-রাস্তা চালু হয়েছে ১৯৩৫ সাল থেকে। আগে হৃষীকেশ থেকে সত্‌পন্থ পর্যন্ত সবটাই ছিল হাঁটাপথ বা পগ্‌দণ্ডী।

এঁকে বেঁকে মোটর চলছে উপরের দিকে। ডাইনে গঙ্গা। বাঁয়ে মোটরের রাস্তা। সারা পথটাই রচিত হয়েছে গঙ্গার পার ঘেঁষে। মোটরের রাস্তা প্রাচীন পথেরই অনুসরণ। পথ উপরের দিকে উঠছে আর গঙ্গা নামছে নিচের দিকে। গঙ্গার জলধারা একশো হাতের মত চওড়া। কোথাও পঞ্চাশ, কোথাও কিছু কম, —কিন্তু কী স্রোত! ঝড়ো মেঘের মত যেন ছুটে চলেছে জলের দুরন্ত ধারা। জলের ঝাপটায় পারের পাথরগুলি যেন কাঠ হয়ে আছে। ভিতরের পাথরগুলিও, মানে গঙ্গার বুকে এক একটা বিরাটকায় শিলাপিণ্ড একেবারে হাত জোড় করে যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তবু রেহাই নেই কারো। দুরন্ত জলের ধারায় শিলা-খণ্ডের তীক্ষ্ণ ধারগুলিকে মুণ্ডিত মথিত করে এগিয়ে চলছে গঙ্গা। এ-স্রোতে পড়লে মহাশক্তিশালী জীবন্ত হাতীও রেহাই পাবে না।

দু'পাশেই গভীর বন। ডাইনে কখনো কখনো পুরানো পায়ে হাঁটার পথটা দেখা যায়। ওপারে দূরে দূরে আরও দেখা যায় ছোট ছোট এক-আধটা ঘর। সাধুদের কুটীর এগুলি। নির্জনে গঙ্গার ধারে তাঁরা জপতপ করেন। মাঝে মাঝে আটদশ মাইল গিয়ে 'ভিক্ষা' নিয়ে আসেন। এমন আকর্ষণীয় গঙ্গাপারের এই পর্ণ কুটীরগুলি! শুধু নির্জন নয় - দুরন্ত গঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন গর্জনে মৌনও বটে।

সাধুদের আশ্রম 'মুনি-কি-রেতী'পার হয়ে গেলো। সামনে

লক্ষ্মণঝোলা। গঙ্গার উপরে ঝোলানো একটি আধুনিক পুল। আগে কাঁচা ছিল। গঙ্গার বন্যায় ভেসে যাওয়ায় পাকা করে গড়া হয়েছে। ছোট্ট একটি আশ্রমপুঞ্জ। পাকাবাড়িও আছে কয়েকটি। ঋষিকুল আর ব্রহ্মর্ষি আশ্রম সহ সংস্কৃত পাঠশালা আছে। এখানে সাধুরা এসে থাকেন। বানপ্রস্থীরাও আসেন। হৃষীকেশ থেকে খুব দূরে নয় কিন্তু নির্জনতা বেশি। সাধু ও তীর্থযাত্রী ছাড়া অন্যলোকের কোলাহল নেই।

গঙ্গা উঠছে। আমরাও উঠছি। পথের চড়াইও বাড়ছে বড় বেশি। চেয়ে চেয়ে দেখছি গঙ্গার জল। এ-জলের বুকে যেন ভাসছে ভারত-ইতিহাসের ছবি। মনের পর্দায় এ ছবি দেখে দেখে এগিয়ে চলছি হিমালয়ের অভ্যন্তরে।

ঘণ্টাকয়েক যেতে না যেতেই গাড়িটা একটা বিকট শব্দ করে ব্রেক চেপে দিলো। সামনেই একটা পাহাড়ী মোড়। রাস্তা বন্ধ। আট দশ হাত চওড়া রাস্তাটির সবটাই পাহাড়ী ধসে বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির দিনে এমনি নাকি হয়ে থাকে।

উপায় কি এখন! উপায় আবার কি? ড্রাইভার হঠাৎ এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বসে রইলো। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্তি নেই। জল ঝরছে অঝোরে। পাহাড়ের আর একটা ধস আবার না এসে পড়ে মোটরের মাথায়। কিছুটা ব্যাক্ করে তাই একটা শক্ত বড় পাথরের আড়ালে গাড়িটাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল ড্রাইভার।

বর্ষায় কেন যে যাত্রীরা বেশি যাতায়াত করে না, মহারাজদের এ-কথার তাৎপর্য এবার বুঝতে শুরু করলাম।

ঘণ্টা দুই পরে রাস্তার ওভারসিয়ার এলো। সারাদিন চললো মাটি সরানো। কিন্তু গুটি দুই বিরাটকায় শিলাপিণ্ড বা বড় বড়

গাছ ক'টার কোন হিল্লেই হলো না। ও-দিকে উপর থেকেও আরেকটি গাড়ি নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ধসের ওপারে।

বিকেল প্রায় তিনটায় গড়িয়ে গেলো। এদিকে পাকস্থলীর অবস্থা তখন শোচনীয়। মোটর-স্ট্যাণ্ডে সেই সকালে চাই-চু'র এক ভাঁড় চা খেয়েছি মাত্র।

শেষে ঠিক হলো নিচের গাড়ি নিচের দিকে ফিরে যাবে। উপরের গাড়ি যাত্রী নিয়ে আবার উঠবে গিয়ে উপরের দিকে। কোনমতে সন্তর্পণে গাছ বেয়ে বেয়ে এপারে ওপারে যাত্রীরা বদল হলো। লটবহর সবারই সামান্য। যে যারটা নিজেরাই বয়ে নিয়ে গেল।

আবার চলতে চলতে মোটর এসে থামলো এক পাহাড়ী পল্লীতে। এ পল্লীতে মেষপালক আর কাঠুরিয়াদের আট-দশটি ঘর। একটা দোকান আছে তারই মধ্যে। কেটলিতে অবিরাম চা ফুটছে। পুরিও পাওয়া যায়। অন্যদিন কি বিক্রি হয় জানি না! সেদিন তো যাত্রীরা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো দোকানীর উনুনের কাছে।

ইস্, যা পুরি! তার উপর দোকানদারের যা অঙ্গশ্রী আর অঙ্গভূষণ! পেটে ফার্নেস না জ্বললে বাজী রেখেও অমন চারটা পুরি কেউ মুখে দেয় না।

ড্রাইভারের তাড়া খেয়ে সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠলো। রাত আজ দেবপ্রয়াগে কাটাতে হবে। ধসের বাধা না পেলে এক-দিনেই কীর্তিনগর অবধি যাওয়া যেত। হাতে তখনো কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। অনেক উত্তরে বলে সূর্যের উত্তরায়ণের সময় রাত হয় ওখানে কিছু দেরীতে।

গাড়ী আবার চললো। বেয়ে বেয়ে এবারের পথ একেবারে

যেন পাহাড়েব চূড়ায গিয়ে উঠেছে। আব পাকিয়ে পাকিয়ে চলেছে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে। দেবপ্রয়াগেব কাছা-কাছি গিয়ে পথটি কিছু নিম্নমুখী হল। অনেক দূবে দূরে দেখা যায়, দিগন্ত-ঘেবা পাহাড়েব ঢেউ। নিচে গঙ্গাও চোখে পড়ে। কিন্তু এত নিচে, যেন ক্ষীণ বেখাব মত। গঙ্গাব দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। শবীবটা সির সির্ কবে ওঠে।

দেবপ্রয়াগেব প্রায় কাছাকাছি এসেছি। মাইল দশেক মাত্র বাকী। হঠাৎ গাড়ীব একটা চাকা সশব্দে পাংচার্ড হয়ে গেলো। ড্রাইভাব ও অ্যাসিষ্টেণ্ট ব্যস্ত হয়ে চাকা বদল কবে ফেলল। তবু লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা।

সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। শুধু গোধূলিব ছায়াটুকু বাকী। ড্রাইভাব যেন একটু চঞ্চল হয়েই গাড়ি চালাতে শুরু করলো। কিন্তু গাড়িটা আবাব বিগড়ে গেলো। আলো জ্বলছে না গাডিব। এদিকে পাহাড়েব ছায়ায় গোধূলিও কালো হযে উঠছে। ড্রাইভাব অস্থিব হযে ব্যাটাবীব তাব ধবে টানাটানি শুরু কবলো। কিন্তু বিদ্যুৎ নিশ্চল।

গাড়ি যাবে কি করে?

ড্রাইভারেব অস্থিবতাব কাবণ কিছুক্ষণেব মধ্যেই বোঝা গেলো। বাতে ও-পথে চলা কঠিন বাবণ। মোড় ফেববাব সময় একটু এদিক ওদিক হলেই…

কথাটা মনে উঠতেই কলকাতা ময়দানেব মনুমেণ্টটা চোখেব সামনে ঝলক দিয়ে উঠলো। ডজন কয়েক মনুমেণ্ট মাথায মাথায খাড়া কবে উপব থেকে যদি একটা মোটব ছেড়ে দেওয়া যায়। তা হলে? সাপে ছোঁয়াব মত একটা ঠাণ্ডা ঢেউ যেন কিল্-বিল কবে উঠে গেল শিবদাঁড়া বেয়ে।

এ-পথে রাস্তাই বা কোথায়! সবটাই তো পাহাড়ী মোড়।

অনেক চেষ্টায় মোটরের একটা চোখে কিছু ক্ষীণ আলো জ্বললেও ও-আলোতে গাড়ী এগুনো যায় না। যাত্রীরা সব হৈ হৈ করে ধরলো গিয়ে ড্রাইভারকে। মোটরে বসেই রাত কাটাবো আমরা! গাড়ী আজ এখানেই থাক!

তীর্থযাত্রী ছাড়া গাড়োয়ালের জনকয়েক লোকও ছিল গাড়ীতে। তারা জানে এ-পথে এ্যাক্‌সিডেণ্টের অর্থ কি।

কিন্তু ড্রাইভার যত নার্ভাস হচ্ছে তত গোঁ ধরছে। গাড়ী চালাবেই। লেট হওয়ার জন্য ফাইন দেবে কে? আর এখানেই বা থাকবো কোথায়? বর্ষার ঢলে পাহাড়ের পাড় ধসে যদি মোটরের মাথায় পড়ে?

বিড়বিড় করে আবার স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

লেটের দায় ড্রাইভারের কিন্তু ল্যাণ্ডস্লাইড? ঝিরঝিরে বৃষ্টি তো লেগেই আছে। যাত্রীরা নিরুপায় হয়ে চুপ করে গেলো। সারা গাড়িময় শুরু হলো বদ্রীনারায়ণের স্তবগুঞ্জন।

আস্তে আস্তেই গাড়ি চলতে লাগল। তবুও ঘন অন্ধকারে এক একটা মোড় নেয় না তো হৃদ্‌পিণ্ডেকে যেন কুড়ালের কোপ মারে।

কিন্তু এসে গেলাম। রাত্রির এরোপ্লেনে যেমন উড়ছি কি ভাসছি বোঝা যায় না —প্রপেলারের আওয়াজ ছাড়া, —তেমনি চারিদিকে জমকালো অন্ধকারের একাকার অস্তিত্বে বোঝবার জো ছিল না যে চাকাটাই শুধু ঘুরছে না মোটরও এগিয়ে চলেছে। শুধু মোড় ঘুরবার সময়টি ছাড়া।

রাত তখন এগারটা। সহযাত্রী এক পুলিস তাদের ফাঁড়িতে নিয়ে শোবার জায়গা করে দিল।

দেবপ্রয়াগ। প্রয়াগ মানে সঙ্গম। যেখানে দুটি নদীর ধারা

এসে মিশেছে সেখানেই একটি করে প্রয়াগ গড়ে উঠেছে। সাধুরা এই সঙ্গমস্থলকে খুব পছন্দ করেন। তাই প্রতি প্রয়াগে গড়ে উঠেছে এক একটি তীর্থস্থান।

দেবপ্রয়াগ ভাগীরথী ও অলকনন্দার মিলন-তীর্থ। এখান থেকে এই যুক্ত-ধারার নূতন নাম হয়েছে গঙ্গা। প্রয়াগের মধ্যে দেবপ্রয়াগের মর্যাদা তাই সবচেয়ে বেশি। একদিকে ভৈরবের জল নিয়ে ভাগীরথী এসেছে। আরেক দিকে মন্দাকিনী, নন্দাকিনী বিষ্ণুগঙ্গা ও পিণ্ডরগঙ্গার জল বুকে নিয়ে নেমে এসেছে অলকনন্দা। যমুনেত্রী থেকে একমাত্র যমুনা বেরিয়ে গেছে অন্য-দিক দিয়ে। তাছাড়া এদিকের সমস্ত হিমালয়-ধারা এসে সম্মিলিত হয়েছে এই দেবপ্রয়াগে। এবং এই পুঞ্জিত স্রোতের অপূর্ব ধারা নিয়ে গঙ্গা নেমে গিয়েছে ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে।

বলতে গেলে উত্তরাপথ শুরু হলো এই দেবপ্রয়াগ থেকে। গাড়োয়াল অঞ্চলের এই তীর্থভূমির পৌরাণিক নাম উত্তরাখণ্ড। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে উত্তরাখণ্ডের প্রশস্তি সবচেয়ে বেশি। সে-যুগের অনেক কীর্তির সঙ্গে এই অঞ্চলের তীর্থস্থানগুলির কাহিনী জড়িত। পুরাণের কাহিনীকে সত্যিকার করে তোলার জন্যই এই সব তীর্থস্থান রচিত হয়েছে, না এসব তীর্থের ইতি-হাসই ওসব কাহিনীতে ভাষাঙ্কিত হয়ে আছে,—তীর্থযাত্রীরা তার প্রশ্ন করে না,—ঐতিহাসিকরাও নীরব।

দেবপ্রয়াগের প্রধান মন্দির রামচন্দ্রের নামে। শোনা যায় শেষ জীবনে রামচন্দ্র এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন। মন্দিরটি অতি প্রাচীন। দক্ষিণ ভারতের সুচারু শৈলীতে গঠিত। উত্তর ভারতে এরূপ প্রাচীন মন্দির বড় দেখা যায় না। পাঠান-মোগলের আঘাত কাটিয়ে উত্তর ভারতে প্রাচীন কালের মন্দির খুব কমই টিকে আছে।

একমাত্র হিমালয়ের এসব দুর্গম স্থানে ছাড়া। হরিদ্বার পার হয়ে হৃষীকেশ অবধি ছুঁয়েই আলাউদ্দিন-আওরঙ্গজেবকে ফিরে যেতে হয়েছে দিল্লীতে। তাই উত্তরাখণ্ডের মন্দিরগাত্রে পাঠান-মোগলের কালাপাহাড়ী হাত পড়েনি।

বলা হয় রামচন্দ্রের মন্দির প্রথম গড়েছেন শঙ্করাচার্য। উত্তরাখণ্ডের প্রায় সব প্রাচীন মন্দিরের পত্তনই শঙ্করাচার্যের নামের সঙ্গে জড়িত। মন্দিরটি সুউচ্চ। মাথায় বিরাটাকার পদ্ম। তার উপর একটি তীক্ষ্ন-শীর্ষ পিতলের দণ্ড।

ভোরবেলা সুন্দর দেখা গেল দেবপ্রয়াগ। অলকনন্দা ও ভাগীরথী এসে মিশেছে রামচন্দ্রের মন্দিরটিকে বেষ্টন করে। মন্দিরের ডান পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেছে একটা বিরাট ঝরনা। দেখতে যেন ছোটো একটি পাহাড়ী নদীর মত। নাম শান্তা ঝরনা। রাজা দশরথ নাকি এখানেই মৃগয়া করতে এসে অন্ধ ঋষির ছেলেকে হরিণ ভেবে শরবিদ্ধ করেছিলেন।

সঙ্গমে গেলাম স্নান করতে। কিন্তু পা বাড়াতে আর ভরসা হয় না। বান-ডাকা দমকা জলের মত বলকে বলকে ছুটে এসে দুটো প্রচণ্ড ধারা যেন মত্ত হাতীর মত মাতামাতি করছে প্রয়াগের সঙ্গমে। জলের মাঝখানের শিলাস্তূপগুলি থর্ থর্ করে কেঁপে কেঁপে একবার ডুবছে আবার ভাসছে। জলরাশি পাথরে পাথরে আঘাত খেয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ছে তুবড়ীর মত।

যাত্রীদের স্নানের জন্য লোহার শিকল ঝোলানো আছে। শিকল ধরে নামতে হয় জলে। কিন্তু তবুও তো! যদি হাত ফসকে যায়!

ভাবতে ভাবতে শিকল ধরে দু'পা নেমেছি কি লাফ দিয়ে সটান উপরে।

পাশের পাথরে বসে জপ করছিলেন এক সাধু। স্মিত হেসে অভয় দিয়ে বললেন: কুছ নঁহী। মছলী।

আরে বাপরে! মছলীও তো! একেবারে শিঙ দিয়ে গুঁতোগুঁতি!

সাধুর কথায় ভরসা করে চেয়ে দেখি দেড়হাতি দু'হাতি সব মাছ। মহাশোল। দমকা জলের সঙ্গে দলে দলে পাথরের গায়ে এক একবার ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। কী গায়ের রঙ! গাঢ় কালোর মধ্যে যেন কাঁচা সোনার দীপ্তি মাখান। মাছ মারা এখানে নিষেধ। মছলীরাও তাই বেপরোয়া।

স্নান সেরে সোজা গিয়ে উঠলাম মন্দিরে। রামচন্দ্রের মূর্তিটি সুউচ্চ এবং অতি সুন্দর। সোনা-রূপার অলঙ্কারের আতিশয্যে স্বাভাবিক প্রকাশ অবশ্য অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে। মন্দিরের চারিদিক নানা কারুকার্যে অলংকৃত করা। উত্তরাখণ্ডের সব মন্দিরেরই এই রীতি।

ভোরে আবার উঠলাম গিয়ে মোটরে। ভাগীরথীর পুল পার হয়ে অলকনন্দার পুল। গঙ্গোত্রীর পথ বাঁয়ে রেখে অলকনন্দার পার বেয়ে এবার শুরু হলো নূতন পথ।

ঘণ্টা কয়েক খুব খাড়াই পার দিয়ে চলার পর কীর্তিনগরের কাছাকাছি এসে রাস্তা অনেক ঢালু হয়ে গেলো। অলকনন্দা এখানে বেশ চওড়া। সমতলের নদীর মত। অলকনন্দার পুল পার হয়ে যেতে হয় গাড়োয়াল শ্রীনগর। মাইল তিনেকের পথ। কিন্তু মোটরের রাস্তা নেই। হেঁটে যেতে হয়।

শ্রীনগর অনেকটা পার্বত্য উপত্যকার সমতলের মত। পাশে সুবিস্তীর্ণ অলকনন্দা। স্রোত আছে কিন্তু তুফান-ছোটা মত্ততা নেই। শ্রীনগরে বসতি আছে। বাজারও আছে। আগে এটা টেহ্‌রী গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল। বছর কয়েক আগের এক আকস্মিক বন্যায় শ্রীনগর ভেঙেচুরে অলকনন্দায় ভেসে যাওয়ায় রাজধানী এখন পাউরীর উঁচু পাহাড়ে উঠে গিয়েছে। এখানকার ঘরবাড়ি তাই সবই নূতন।

খুব ভোরে শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে সকালেই গিয়ে পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগে। রুদ্রপ্রয়াগ মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম। সঙ্গমের ঠিক মাঝখানে একটা খুব বড় শিলাখণ্ড। অলকনন্দা আর মন্দাকিনীর দুরন্ত ধারাকে অগ্রাহ্য করে জেগে রয়েছে নির্বিকার ভাবে। লোকেরা বলে নারদমুনি এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন এবং নারায়ণ এসে দেখা দিয়েছিলেন রুদ্রমূর্তিতে। তাই এ তীর্থের নাম হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগ।

অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর রুদ্র সঙ্গম দেখেই বোঝা যায় কেন এই প্রয়াগের নাম রুদ্রপ্রয়াগ হলো। প্রয়াগের পাশেই রুদ্র-নারায়ণের মন্দির।

এবার থেকে পথের সঙ্গী হলো মন্দাকিনী। অলকনন্দা পড়ে রইলো ডান পাশে।

মোটর-যাত্রা রুদ্রপ্রয়াগেই শেষ। এখান থেকেই যেন আরম্ভ হলো সত্যিকার হিমালয় যাত্রা। যন্ত্রযান আর নেই। পা'ই হল অগ্রগতির অবলম্বন। ঝোলাটা পিঠে আর ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে লাঠি হাতে চল্লাম এগিয়ে।

পায়ে হেঁটেই যে যেতে হবে এমন নয়। কাণ্ডী ডাণ্ডি চড়ে বা উবুথুবু হয়ে কুলীর পিঠে বসেও যাওয়া যায়। নয়তো ফটিক-

চাঁদের মত টাট্টু ঘোড়ার পিঠেও। ভাড়া কম নয়। কিন্তু পায়ে চলার মত আনন্দ নেই কিছুতেই।

মাইল চারেক হাঁটার পরেই রাস্তা চড়াই হতে লাগলো। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে রাস্তা। কোথাও একটু-আধটু যা নামছে তা আবার উঠবার জন্যেই।

সামান্য একটা ব্যাগ আর ঝোলা,—তারই নাকি এমন দাপট! ওজন তো হবে সাত আট সেরও নয়। এগুচ্ছি আর মাঝে মাঝে ব্যাগ আর ঝোলাটা কাঁধে পিঠে বারবার বদল করে নিচ্ছি। বোঝার চাপে মন্দাকিনীর কলোচ্ছ্বাস ছেড়ে মনটা কখন যে বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠল।

মাধ্যাকর্ষণের ফর্মুলাটা না যেন কি? ম্যাস্ ইনটু জি ইনটু……। কিন্তু তাহলেও এত ভারী লাগবে কেন?

ফর্মুলা মেলাতে মেলাতে একটা কাঁচা চটিতে এসে উঠলাম দুপুরে। চটি মানে পাতা-ছাওয়া একটানা একটা ঘর। সামনেটা খোলা। পাশাপাশি এক একটি পাটি কি চাটাই পাতা। প্রতি পাটির গায়ে লাগানো ঘরের ভিতে খোড়া আছে এক একটি করে উনুন। চটির মধ্যে দোকান আছে। তাতে আছে চাল, ডাল, আটা, ঘি ও নুন। রান্নার থালাবাসন দোকানীই দেবে। ভাড়া নেবে না তার জন্য। তবে জিনিসপত্রের দাম যা নেবে তাতেই সব উসুল।

দুপুরের খাওয়া ভোরেই শ্রীনগর থেকে সেরে এসেছিলাম। অন্তত আজকে দুপুরের জন্য তো রান্নার হাত থেকে রেহাই পাবো।

একটু দুধ কিনে খেয়ে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম। জিনিস-পত্রের জন্য ভাবনা নেই। চটিতে কোন জিনিসই খোয়া যায়

না। খাবার-দাবারের জিনিসের বলে কয়েই দাম নেবে অনেক। কিন্তু চুরি করবে না কেউ। যদি বিদেশী যাত্রীরা কেউ কারোটা নিয়ে না নেয়।

বিকেল গড়াতেই আবার শুরু হলো চলা। ক'জন সঙ্গী জুটে গেল এখানে। দক্ষিণ-ভারতী। মেয়ে বুড়োয় মেলান একটি যাত্রীদল।

কিছুদূর যেতেই ওরা এগিয়ে গেলো অনেক দূরে। বর্ষাও শুরু হয়েছে দুপুর থেকেই। ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে দিয়ে শরীরটা যেন আরো ভারী হয়ে উঠলো। বাঁ হাতে ছাতি, ডান হাতে লাঠি। আর পিঠে ঝোলা দুটো। পাহাড়ী ঢঙে বঙ্কিমাঙ্গ হয়ে ব্যাগের হাতলটা কপালে বেঁধে নিলাম। কিন্তু পাহাড়ী নকলে চলবে কেন। কপালে চাপ দিই তো ঘাড় টন্‌টন্ করে। ঘাড়ে নিই তো দশ সের যেন এক মণ হয়ে দাঁড়ায়।

······কুলী নেবেন না?

মহারাজদের বিস্মিত প্রশ্নটা এবার যেন কানের কাছে খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। সাত আট সের আবার একটা ওজন। প্রশ্নটা তখন গ্রাহ্যই করিনি। বাহাদুরীটা যে উবে যাবে দু'দিনেই তা বোধ হয় মহারাজদের অজানা ছিল না। জ্ঞান মহারাজ তাই আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ঠিক আছে টাকা তো কিছু বেশি রইলই। না হয় তখন বুঝেসুঝে একটা ব্যবস্থা করে নেবেন। ভবিতব্যের হাসিটা অবশ্যি আমার সামনে হাসেননি তখনও জ্ঞান মহারাজ। কিন্তু এখানে যে কুলী পাওয়ারও জো নেই, উত্তরকাশী না পৌছঁন পর্যন্ত।

উঠে বসে জিরিয়ে কোনমতে সন্ধ্যার আগে অগস্ত্যমুনি এসে গেলাম।

অগস্ত্যমুনি মানে একটি সুশ্রী পল্লী। মন্দিরও আছে ছোট ছোট কয়েকটি। কিছু সমতল জায়গাও আছে। পুরাণের অগস্ত্য-মুনির নামে জায়গাটির নামকরণ হয়েছে। একদা এখানে নাকি তাঁর তপোবন ছিল।

মন্দিরের মূর্তিগুলি ছোট কিন্তু সুঠাম। মন্দিবেব বাইরের অঙ্গনেও অনেক ছোট ছোট মূর্তি আছে। নিখুঁত কারুকার্যে গড়া। সবই প্রায় শিব-পার্বতীর। দেখে মনে হয় খুব প্রাচীন। মন্দিরের গায়ে আঁকা রয়েছে অনেকগুলি শিলালিপি। কি লেখা আছে 'পাণ্ডারা বলতে পারে না।

কালীকমলীর দারোয়ানকে বার দুই ভাই-টাই বলে কিছু পয়সা দিলাম। ওবই হাঁড়ির অন্নে জঠবাগ্নি নিবারণেব একটা উপায় হল। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তাই একটু গা এলিয়ে দিলাম ধর্মশালার এক ঘরে।

......আপ.আয়ে হ্যাঁয়।

মোমবাতির আলোতে চেয়ে দেখি একটি বছব পঁচিশেব সুকান্ত যুবক।

আপ কি সেবা মেঁ অগর কই......

আমার সেবায়! বুঝে.উঠতে পারলাম না কথাটা। প্রশ্ন-কর্তার ভাষা ও ভূষা দুইই আলাদা। পল্লীর মত নয়। পবে শুনলাম, ডাক্তার। তীর্থযাত্রীদের দেখবার জন্য সরকারী কাজে আছে এখানে।

কিন্তু সেবার আগ্রহের আসল কারণটা বোঝা গেল পরদিন ভোরবেলায়। আমাকে এগিয়ে দেবার সময়। যুবকটি আজাদ হিন্দে লড়াই করেছে। বাঙালী দেখলেই তার বড় টান। নেতাজীও বাঙালী তো!

নেতাজীর সাথে পরিচয় ছিল শুনে তো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো।

তব্ তো নেতাজী কে বারে মেঁ আপ জরুর কুছ···

উত্তরের জন্য তর সয় না তার। নিজেই অনর্গল বলে যেতে লাগলো সুভাষচন্দ্রের কথা,—আজাদ হিন্দের লড়াইয়ের কথা। শেষে যেন নিজেই বুঝাতে লাগলো নিজেকে :

নহ্ঁী! ওহ্ কভি নহ্ঁী মর্ সকতে। আয়েঙ্গে! জরুর আয়েঙ্গে!······অগর আজ হিন্দুস্তান মেঁ নেতাজী হোঁতে। ······আরে কোন্ অ্যাসে লীডার হ্যাঁয়! ······বিজলী কি কারেণ্ট জ্যাসা খিচঁতে থেঁ নেতাজী!

দেখলাম পরশমণির পরশ আজো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে যুবকটির মধ্যে!

সূর্য উঠেছে সবে মাত্র। ঝিলিমিলি রাঙা আলো পাহাড়ের মাথায় মাথায়। এ-ফাঁক ও-ফাঁক দিয়ে এসে মুঠোমুঠো করে ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে।

কে যেন আপনা থেকেই টেনে নিয়ে চললো পা দু'টিকে। রাতের বিশ্রামে পিঠের ঝোলাটা তখনও বোঝা হয়ে ওঠেনি।

ওটা কি! ওই যে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে!

ঝলমল করে ফুটে বেরিয়েছে একটা পর্বতের চূড়া। মাথায় নীলাকাশ। সামনে আলোর ঝরনা। সাদা বরফের আস্তরণে উর্ধ্বাঙ্গ ঢাকা। রোদে-বরফে মিলে যেন কাঁচা সোনার গায়ে ঝরে পড়ছে মিঠে আলোর অজস্র শিহরণ। স্বচ্ছ আকাশের বুকে পর্বত শিখরের তীক্ষ্ণ রেখাঙ্কিত মাথার কিছুটা দেখা যায় মন্দাকিনীর পথ-চলার সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে। সাদায় নীলে সোনার কাঠি

ছুঁইয়ে দিয়ে সূর্য যেন নিপুণ শিল্পীর মত সাজিয়ে রেখেছে পর্বত-শিখরটিকে।

পাহাড়ীরা বললো,—ওরই কোলে নাকি কেদারনাথের মন্দির। মেঘ না থাকলে ভোরে আর বিকেলে এমনি অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

এবার তাহলে সত্যি হিমালয়ের তীর্থ দর্শন শুরু হলো।

দুপুরে একটি চটিতে জিরিয়ে গুপ্তকাশীর দিকে রওনা হলাম।

বিকেলে হাঁটতে হবে মাইল ছ'য়েক। কিন্তু ছ'মাইল যাওয়া যে কি! রুদ্রপ্রয়াগ দু'হাজার ফিট উঁচু। এর মধ্যে আরও হয়ত এক হাজার ফিট উপরে উঠেছি। কিন্তু গুপ্তকাশীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট। আরও দেড় হাজার ফিট উঠতে হবে এই ছ'মাইল পথে।

দশ মিনিটও যেন আর একটানা হাঁটা যায় না। চলি আব মিনিট পাঁচেক করে জিরিয়ে নিই পাথরের গায়ে গায়ে হেলান দিয়ে। আর ঢোকে ঢোকে জল গিলি ফ্লাস্ক থেকে। কম্বল আর গরম জামাগুলি ভিতরে না থাকলে কখন ঝোলাটি মন্দাকিনীকে উৎসর্গ করে দিয়ে ও দুর্বহ জ্বালা থেকে মুক্তি পেতাম।

মাইল তিনেক উঠেছি। কিন্তু আর চলা যেন অসম্ভব। এখান থেকে সবটা রাস্তাই খাড়া। তবু না চলেও উপায় নেই। কোন পল্লীও নেই কাছে। দু'পাশ ঘিরে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল।

দু'একজন যাত্রী পাশ দিয়ে আসে যায়। কিন্তু আশ্বাস নেই কারো কাছ থেকে। তীর্থযাত্রীরা কেউ কারো দিকে তাকায় না। যে যার মত হাঁপায় আর ওঠে, ওঠে আর হাঁপায়। আগে

পিছে কে রইল তার খোঁজ হয় গিয়ে সামনের চটিতে। আবার একত্র হয়ে।

চোখ বুজে পাথরে শুয়ে দম নিচ্ছি।

'মুঝে একঠো ব্যাগ দিজিয়ে বাবুজী।'……

কল্পনা করছি না তো!

আবার সেই নম্র আওয়াজ।

বাবুজী! …না সত্যি, খাঁকি শার্ট পায়জামা পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী গাড়োয়ালী যুবক।

এরও মুখে আজাদ হিন্দ্ ও নেতাজীর কথা। আজাদ হিন্দের লোকজনের রক্তে যেন এখনও জেগে রয়েছে নেতাজীব সেই অমৃত-স্পর্শ।

দিল্লীতে গিয়েছিল সে আজাদ হিন্দ ফৌজের কমিটি বৈঠকে। বিক্ষুব্ধ স্বরে বললো: 'কিছুই হবে না আমাদেব বাবুজী। না চাকরি, না পেন্সন।

'ইংরেজ সরকারের কাছে যারা বললে, আমাদের জোর করে, ভয় দেখিয়ে ফৌজে ভর্তি করা হয়েছিল সে সব 'কায়ের'দের আবার ফৌজে নেওয়া হ'ল। আর যারা গুলি-ফাটকের ভয় না কবে বললে—হম খুদ খুশিসে আজাদী কি লড়াই মেঁ সামিল হুঁয়ে--তাদের কাজ ত হলোই না, পেন্সনও গেলো।

'ভাবলাম, আজাদী হলে সব ফিরে পাব। ……বাহ্! ……সরকাব নে হমে সাফ জবাব দে দিয়া। ফৌজে আর ভর্তি চলবে না, পেন্সনও দিতে পারবো না…বাকী বেতনেব কথা ভেবে দেখবো।……

'ক্যায়া আজাদী! অগব নেতাজীকা আজাদ্ হিন্দ্ ন হোতা তো ক্যায়া মিলতি ইনকো গদ্দী?…'

রাগে ক্ষোভে সৈনিকটি যেন ফেটে পড়তে লাগল।

ওর মুখে শুনলাম গাড়োয়াল প্রান্তের প্রায় চার পাঁচ হাজার হিন্দুস্থানী ব্রিটিশ-ফৌজ আজাদ হিন্দে যোগ দিয়েছিল।

গাঁড়োয়ালের সর্বত্র 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন করার সাধারণ রেওয়াজ দেখে একটু বিস্ময়বোধ করেছিলাম প্রথমে। এবার তার আসল কারণটা বোঝা গেলো।

গুপ্তকাশী ছোট্ট একটি পাহাড়ী শহর। শহর মানে বড় পল্লী। দোকানপাট আছে কিছু। লোকের বসতিও মন্দ নয়।

ভোরে উঠে গেলাম মন্দির দেখতে। একটি সুউচ্চ পর্বতের গায়ে মন্দিরটি। গুপ্তকাশী নাম কেন হলো তার ঐতিহাসিক সংবাদ কিছু জানা যায় না। জানাবার থাকলেও পাণ্ডারা তার জবাব দেয় না।

পৌরাণিক ব্যাখ্যা পাণ্ডারা অবশ্য শুনিয়ে দেবে সবাইকে। গঙ্গা ও যমুনা পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে এখানে এসে যুক্ত হয়েছেন এবং বিশ্বনাথও গোপনে এসে মিলিত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। তার প্রমাণ স্বরূপ পাণ্ডারা দেখিয়ে দেবে দু'টি ঝরনার মুখ। মন্দিরের চত্বরে দুটো ইঁদারার মত করে বাঁধানো রয়েছে ঝরনার মুখ দুটি। এমনিতর ঝরণার তীর্থনাম হলো কুণ্ড। অবিরাম জল আসছে আর কুণ্ডের বাঁধান পাড় ছাপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা এসব কুণ্ডে স্নান ও পিণ্ড তর্পণ করে। আর হাতজোড় করে শোনে পাণ্ডাদের মন্ত্রোচ্চারণের নিরবচ্ছিন্ন আবৃত্তি।

মন্দিরটি পুরানো শৈলীতে গঠিত। সামনে একটি শিবলিঙ্গ। পিছনে সাজানো রয়েছে আরও কয়েকটি পাথরের মূর্তি। প্রায় সব মূর্তিই হর-পার্বতীর। নানা ব্যঞ্জনায় গড়া। মূর্তিগুলি

অতি সুন্দর। যেন ভাস্কর্যের নিখুঁত নিদর্শন। খুব দীর্ঘ নয়,— দেড় হাত, কোনটি দু'হাতও হোতে পারে। যেমন ব্যঞ্জনা তেমনই অঙ্গ-সৌষ্ঠব। সুন্দর যেন নিশ্চল রেখায় বিমূর্ত হয়ে রয়েছে এসব দেব বিগ্রহের অঙ্গ-বিভায়।

প্রধান মূর্তিটি নিমিলিত-নেত্র শিবের। উরুতে বসা স্মিত-নয়না গৌরী। শিবের গলা-জড়িয়ে একটি উদ্যতফণা নাগিনী। জটা ত্রিকোণের মত করে বাঁধা, চূড়াটি ‐মলাকৃতি। গৌরী-শঙ্করের প্রতি অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ। শিব এক হাতে গৌরীকে আবেষ্টন করে আছেন, আর হাতে তাঁর ডমরু।

গৌরীর বাহুবল্লরী শঙ্করের কণ্ঠলীনা। তাঁর অঙ্গ স্পর্শে জড়িয়ে আছে যেন কিসের এক পরমাগ্রহ। স্মিত মাধুর্যের লাবনি মাখা গৌরী শঙ্করের ও মুখ যেন বর্ণনার অতীত।

আরো অনেক মূর্তি আছে। নটরাজের একটি মূর্তি চোখকে বিস্মিত না করে পারে না। তরঙ্গায়িত নৃত্যের অপরূপ সুষমায় আপনিই যেন বিমোহিত হয়ে পড়েছেন নটরাজ। হারাতে চাইছেন না সেই পরম মুহূর্তের ব্যঞ্জনাটিকে। নৃত্যের মাঝখানে তিনি যেন আকস্মিক নিজেকে দেখে নিজেই বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাই নটরাজের মূর্তিটি হয়েছে স্থির ও অচঞ্চল।

পথে পথে অনেক ছোট ছোট মন্দির পড়ে আছে। জীর্ণ, ভগ্ন, দুয়ার খোলা। যত্ন নেবার কেউ নেই। কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি যে রয়েছে এসব মন্দিরে। এক হাত, দেড় হাত। আবার কোনো কোনোটি অতি ছোট। মন্দিরগায়ে থাকে থাকে সাজানো।

হাত পা' ভাঙ্গা অবস্থায়ও ছড়ানো রয়েছে আরও অনেক

মূর্তি। অত ছোট ছোট গড়ন—কিন্তু খুঁত নেই একটুও। যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতা তেমনি ব্যঞ্জনার মাধুর্য। শিলালিপিও আছে অনেক মন্দিরে।

যাত্রীদের দর্শনী নেই বলে বিবর্জন ও অবহেলায় পড়ে আছে এসব মন্দিরগুলি। আর তার সঙ্গে হয়তো উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে কত শতাব্দীর আবেগ ও বেদনার ইতিহাস। ইতিহাস না হোক শিল্প তো! পাথর কেটে যাঁরা এমন অপরূপ বিগ্রহ গড়েছেন তাঁদের রচনাকে পরম সমাদরে বরণ করে নেবার আগ্রহ যে কবে হবে আমাদের!

গুপ্তকাশী থেকে কেদারনাথের পথ শুরু হলো। দুর্গম, নির্জন ও একটানা চড়াই। প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে গিয়ে কেদারনাথ।

পথ উপরে উঠছে। বনের গভীরতাও বাড়ছে। মন্দাকিনী এখন আর পথের কাছে কাছে নয়। মাঝে মাঝে বনের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে। মন্দাকিনীর খর ধারা আন্‌মনা পথিককেও এতক্ষণ স্মরণ করিয়ে দিত যে তার পাশেই আছে সদা মুখরিতা আর কেউ। এখন চোখে পড়লেও নদীর ধারা অনেক নিচে, দু'পাশের পর্বতমালার গভীর খাদে।

বন বড় বেশি ঘন এখানে। আশেপাশে কোথাও একটা ঘরও চোখে পড়ে না। কোন পল্লীও নেই ধারে কাছে। শীতের দিনে এ স্থানের সবটাই বরফে ঢেকে যায়।

এখানে একলা চলায় ভয় না করে উপায় নেই। প্রকৃতির নামে তো কত আমাদের কাব্য দর্শন। কিন্তু মানুষ না হোক, মানুষের বোনা দুটো ধান গাছও তো থাকা চাই কাছাকাছি।

একটা ঘর কিঁ একটু ক্ষেত দেখে তবে মানুষের স্বস্তি। যে প্রকৃতির গায়ে মানুষের একটুকুও দাগ নেই, সেখানে প্রাকৃত হওয়াও সহজ নয়।

ও, বলতে ভুলে গেছি। এখন কিন্তু আমি আর একলা পথিক নই। বাহাদুরীর মাথা মুড়িয়ে আর এক বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়েছি গুপ্তকাশী থেকে। নেপালী ধনসিং বাহাদুর। ব্যাগ দুটি বইবে, আর আমার জন্য চটিতে চটিতে রান্না করবে।

এ পথে বাঘ, ভালুক এবং অন্যান্য বুনো জন্তুও আছে। তবে যাত্রীদের কাউকে আঘাত করেছে বলে শোনা যায় না। গাছে গাছে অনেক হনুমান দেখা যায়। কিন্তু বড় ভীতু। এক জায়গায় দেখলাম একদল হরিণের বেপরোয়া ভাব। দল বেঁধে পাথরের গা থেকে নুন চেটে খাচ্ছে। কিন্তু যাত্রীদের রাস্তায় নয়। মন্দাকিনীর ওপারে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এবার কিন্তু বোঝামুক্ত দেহকে পথ আর তেমন কাবু করতে পারল না। একদিনেই পনের মাইল উপরে উঠে এলাম রামপুর চটিতে। রামপুর সাত হাজার ফিট উচু।

সামনের গন্তব্যস্থল ত্রিযুগীনারায়ণ। এ স্থানটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় কেদারনাথের দিকে। তাতে মাইল কয়েক পথ বাঁচে।

কিন্তু এটা কি ছেড়ে যাওয়া যায়! এ তীর্থ হলো শিব ঠাকুরের বিয়েবাড়ী। তিন যুগ আগে সতীর দেহত্যাগের পর নারায়ণকে সাক্ষী রেখে শিবঠাকুর এখানেই হিমালয়-দুহিতা পার্বতীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই কাহিনী নিয়ে ত্রি-যুগ ধরে নারায়ণ বসে আছেন এখানে।

এই তীর্থ-মাহাত্ম্যের বর্ণনা।

রামপুর থেকে যাত্রা শুরু করলাম রোদ ওঠার আগে। ধন

সিং এগিয়ে গেছে। আমার পদক্ষেপ মন্থর। সামনে একটি মেয়ে। পিঠে ঘাস পাতার বোঝা। ঠিক কিশোরী নয়, কিছু বড়। ছেঁড়া, নোংরা, কালো একটা কম্বল গাউনের মত করে পরা। গলায় পাহাড়ী পুঁতির এক গুচ্ছ মালা।

দুটো একটা কথা বলতে বলতে চলছি ওর সাথে। এমনি সময় পিছন থেকে একটা লোক প্রায় ধমকের কণ্ঠে বলে উঠল,—

'আরে অ বাবুজী! ইয়ে তো অছ্যুত হ্যায়।'

--মানে এর সাথে পাশে পাশে কথা বলে চলছো? করছো কি?

গাঢ়োয়ালীর কণ্ঠে ঘেন্নার স্থর ছাপিয়ে উঠল।

লোকটার মন্তব্যে মেয়েটা যেন এতটুকু হয়ে গেলো।

অস্পৃশ্যদের সঙ্গে এরা এখানে এমনি ব্যবহার করে। পল্লীর বাইরে থাকতে দেয়। 'বরহ্মনরা' এদের ছায়াও মাড়ায় না।

সৃষ্টি-দেবতা কিন্তু এদের অস্পৃশ্য করে গড়েন নি। যেমন রঙ তেমনি টানাটানা চোখমুখ। চোখ দুটিতে যেন সদ্য-শিশুর নীলাঞ্জন মাখা। এত গরীব। কিছুই খেতে পায়না বল্লেই চলে। তবুও সমস্ত দেহে সুকান্তির স্নিগ্ধতা। শুধু এ নয়, গাঢ়োয়ালের সব পাহাড়ী মেয়েরাই এমনি। সাদা নবনীর গায়ে যেন গোলাপের ছোপ দেওয়া এক একটি আঁপেলের মত।

অস্পৃশ্যরা অনার্য বংশোদ্ভব বলে এতকাল শুনে এসেছি। কিন্তু এ-রূপ যে সমতলের কত আর্যনারীরও ধ্যানের সামগ্রী! এরা কি সত্যিই অস্পৃশ্য? না এদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে? না দীর্ঘকালের বর্ণ-সংকর? কিন্তু বর্ণান্তরের রক্তকণা থাকলেও এদের মধ্যে তার একটু প্রকাশও যে নেই আজ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ডুবে গেলাম বন ও পাহাড়ের মধ্যে।

চড়াই যত বাড়ছে পাহাড়ের যেন আর একটা নুতন রূপ ফুটে উঠছে। গাছে গাছে কচি পাতায় সারা পাহাড় শ্যামল। পাহাড়ের মাথায় নূতন দূর্বা। কোন কোন পাহাড়ের চূড়ায় তুষার পাতের ছোঁয়া তুলি-স্পর্শের মত এখনও লেগে রয়েছে। শীতের. বরফ গলা এখনও শেষ হয়নি। চাদরের মত জড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে। তারই গা থেকে সরু সরু ঝরনার মত অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। যেন গোছা গোছা রূপোর সুতোর মত।

পথের পাশে বড় বড় ঝরনাও আছে অনেক। গর্জনশীল, উন্মত্ত। দর্পিত রোষে ভেঙ্গেচুরে বড় বড় শিলাখণ্ডকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে মন্দাকিনীর দিকে। এদের অপ্রতিহত দাপটে বনে-পর্বতে সর্বত্র যেন একটা অবিরাম কাঁপুনি লেগে আছে।

কিন্তু এসব দুরন্ত ঝরনার চেয়েও ভাল লাগে ক্ষীণতোয়া ঝরনাগুলিকে। উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে সোজা সরলরেখায় ঝরে পড়ছে মন্দাকিনীতে। গায়ে রয়েছে বিচ্ছুরিত বাষ্পের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। সামনেই ত্রিযুগীনারায়ণ।

ত্রিযুগীনারায়ণও তেমনি প্রাচীন মন্দির। শঙ্করাচার্যের একই দক্ষিণী শৈলীতে রচিত। মন্দিরের আঙিনায় একটি প্রজ্জ্বলিত কুণ্ড। ভিতরে নারায়ণের বিগ্রহ। পুরোহিতরা বলেন এই অগ্নিকুণ্ডকে সাক্ষী রেখেই শঙ্কর হিমালয়-দুহিতা গৌরীকে বিবাহ করেছিলেন। সেই থেকে এই অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে অনির্বাণ। অর্থাৎ পুরোহিতরা ইন্ধন দিয়ে জ্বালিয়ে রাখছে দারুণ বরফের সময়েও। ভিতরে নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বিগ্রহ। দু'পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী। প্রতিটি বিগ্রহই পাথরের। কিন্তু একটি করে সোনার পাতে গড়া প্রতিমূর্তিও রয়েছে। বিগ্রহের শৃঙ্গারের উদ্দেশ্যে গঠিত এই স্বর্ণময় প্রতিচ্ছবিগুলি।

বাইরেও অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি আছে। লক্ষ্মী, নারায়ণ ও সরস্বতীর। সমুদ্রমন্থন ও নারায়ণের অনন্ত-শয়নের মূর্তিই বেশী। কিন্তু অধিকাংশ মূর্তিই অযত্নে পড়ে রয়েছে। কিছু কিছু ভেঙ্গেও গেছে। শ্যাওলা পড়েছে অনেক মূর্তির গায়ে। এমন অমূল্যধনের দিকে পাণ্ডা-পুরোহিতদের কোনো দৃষ্টি নেই। কারণ, এতে নেই কোন দক্ষিণা।

ধনসিং আছে। এখন আর ভয় কি। ডাল আর আলুসেদ্ধ, তার সঙ্গে দুধ। কখন থেকে যে এ-খাওয়াই সুপাচ্য পরমান্ন হয়ে উঠেছে। আর চা তো চটিতে চটিতেই পাওয়া যায়।

জলটা সম্বন্ধে যা সতর্কতা। গরম করে টিনে ভরে রাখে ধনসিং। হিল ডাইরিয়াকে বার দুই ঢুঁ মেরেই তাই ফিরে যেতে হয়েছে। পাত্ পায়নি ধনসিংয়ের সাবধানীতে।

দুপুরে দুপুরেই রওনা হয়ে পড়লাম কেদারনাথের দিকে। রাতে গিয়ে রামবারা চটিতে থাকবো। রামবারা কেদারনাথের খুব কাছে। সোয়া ন'হাজার ফিট উঁচুতে।

ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে একটু নেমে এসেই পথ একেবারে খাড়া হয়ে উঠেছে উপরের দিকে। আট দশ মাইল রাস্তায় উঠতে হবে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু।

ত্রিযুগীনারায়ণ থেকেই তীব্র হয়ে উঠেছে শীতের স্পর্শ। তাড়াতাড়ি গরম জামাকাপড় পরে রওনা হ'লাম কেদারনাথের দিকে।

তিন মাইল পথ মাত্র বাকী। ভাবলাম, একঘণ্টা কি বড় জোর দেড়ঘণ্টায় পৌঁছে যাব কেদারনাথে।

লক্ষ্য কাছে এলে চলার গতি নিজ থেকেই বেড়ে যায়। পা-ও তাই কদম্ কদম্ বাড়িয়ে চলতে লাগলো উপরের দিকে।

কিন্তু ও হরি! চরণযুগলের উচ্ছ্বাস যে বেশি দূর টিকলো না। কিছুটা চলতে না চলতেই শরীর যেন লোহার মত ভারী হয়ে উঠলো।

সামনে সমতল পথ নেই একটুও। সবটাই চড়াই। পাকিয়ে পাকিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে উঠতে হবে প্রায় চার হাজার ফিট উচুঁতে। পা যেন আর কোনমতেই এগুতে চায় না। এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছি আর শ' দু'শ হাত যেতে না যেতেই বসে বসে দম নিচ্ছি।

পাহাড়ী পথ এবার তার আসল রূপ দেখাতে শুরু করলো।

আমরা উঠছি। মন্দাকিনীও উঠছে উপরের দিকে। মন্দাকিনী এখন আর নদী নয়। যেন অঝোরে ঝরা শত ঝরনার এক চলন্ত মালিনী। পাথরে পাথরে আছাড় খায় আর ঘটায় বিস্ফোরণ। মন্দাকিনীর বুকে তাই অবিরাম চলছে বাষ্প ও শব্দের কোলাকুলি। পাহাড়ের চাপে মন্দাকিনী কোথাও খুব সংকীর্ণ। কোথাও আট দশ হাত প্রশস্ত। পাশ কমছে তো গতি যেন আরো বেগতিক বাড়ছে। আহতা নাগিণীর মত ফণা তুলে লাফিয়ে পড়ছে এ-পাথরের উপর থেকে ও-পাথরের উপরে। শিলাখণ্ডগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তবুও নির্মম গতিতে এগিয়ে চলছে দর্পিতা মন্দাকিনী।

বাঁ হাতে কোমর চেপে ডান হাতে লাঠি ভর দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলছি। দেহভারের দুঃসহ বোঝায় পিঠটা নুয়ে পড়েছে।

কিন্তু ক্লান্তিরও যে ক্লান্তিহরণ আছে! নইলে এমন পথে কি রচিত হয় তীর্থস্থান?

কিছুদূর উঠতেই চারদিকে যেন সহসা অজস্র ধূপকাঠি জ্বলে উঠল। ধোঁয়া নেই কিন্তু গন্ধে ভরপুর।

চেয়ে দেখি সমস্ত পাহাড় বুনো ফুলের সমারোহে ছেয়ে আছে।

শীতের দিনে কেদারনাথের পাহাড় বরফে ঢেকে যায়। বরফ গলে গেলে কচি কচি লতাপাতা ও ফুলের গাছে পাহাড়ের কালো আস্তরণ শ্যামাঙ্গ হয়ে ওঠে। দূর থেকে তাই দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে শ্যামবর্ণের মখমল বিছানো হচ্ছে। অজস্র ফুলের কাজ করা গালিচার মত।

বড় নয় কোন ফুলই। কিন্তু বিচিত্র ওদের রঙের বাহার। পল্লবের আকারও তেমনি বিচিত্র। এমনি বর্ণ আর পল্লব সমতলের কোথাও বড় চোখে পড়ে না। ঘন সাদা পাপড়ির নিচে কোথাও শ্যামবর্ণের ছোঁয়া। কোথাও আরক্তিম পল্লবে কালো বর্ণের বিন্দুচ্ছটা। নীল কুসুমের পরাগে কোথাও হলুদের হালকা রেণু। ফুলগুলি ফুটে রয়েছে কোথাও একা, কোথাও বা গুচ্ছে গুচ্ছে। শুধু বর্ণে নয় গন্ধেও চারদিক সুরভিত।

প্রকৃতির এই উদার প্রকাশে মরা মনও সজীব হয়ে ওঠে। আপনা থেকেই এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

কেদারনাথের কাছাকাছি থেকে নাকি দেখা যায় দূর হিমালয়ের শ্বেত-শান্তশ্রী। কিন্তু চারদিকে ছাওয়া বাদলের জন্য দূর-আকাশের সবটাই ছিল মেঘে ঢাকা। কোন দিকেই মেঘের ঢেউ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

মনটা বড় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। কেন এই বঞ্চনা ? মেঘমালার কি একটুও মমতার স্পর্শ নেই !

ভাবছি, আর চেয়ে আছি আকাশের দিকে। যদি মেঘের অবগুণ্ঠন একটু উন্মোচিত হয়।

বুঝি পৌঁছলো আবেদন। বাদলের ঘনচ্ছটা তরল হয়ে এলো।

পাহাড়ী বাদলের এমনি ধারা। এই আসে এই যায়।

মসলিনের মত স্বচ্ছাভ হয়ে উঠলো আকাশের নিবিড় মেঘ। তার ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠলো সুস্থির এক বিচিত্র তরঙ্গায়ন। শুভ্র, শান্ত, স্বর্ণশ্রী। হিমাঙ্কিত গিরির নভতল বিস্তীর্ণ তরঙ্গ রেখা। যেন সজল কোন এক সৌম্য অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে ভেসে আছে অনন্ত আকাশের নীলিমায়।

সুন্দর যখন উদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। হিমালয়ের কল্পনা হয়েছে শঙ্করের আবাস রূপে। শঙ্কর তাই রূপান্তরে নটরাজ। হিমালয়ের তরঙ্গ বিসরণের মতই তাই নৃত্যময়। কবির কল্পনায় শঙ্কর একদিকে লীলাময়, আরেক দিকে ধ্যাননিমগ্ন। কাছে থেকে এই হিমালয়কে না দেখলে কবি-কল্পনার উৎসটিকে বোঝা যায় না। দিগাঙ্গন জুড়ে তরঙ্গ বিসরণের মত ছড়িয়ে রয়েছে হিমালয়ের গিরিমালা। আবার তেমনি নিবিড় স্থৈর্যে তন্ময় হয়ে রয়েছে তার অবস্থান।

আকাশ যদি বাদল ছাওয়া না হয়ে স্বচ্ছ নীলিমায় নির্মুক্ত হয়ে থাকতো! তবে কি অমন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতো হিমালয়ের তরঙ্গমালা? কিছু আলো কিছু ছায়া,—আলো-কালোর এমনি ঢেউয়ে ঢেউয়েই তো সৌন্দর্যের কল্পনা।

আহা মরি মরি! এ কী রূপ হিমালয়ের!

কোন সুনীলাভ বসনে অনুপম রূপসীর ললিত অঙ্গকে ছায়াময়ী করে তুলবার আগ্রহে শিল্পীর তুলি যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে! অনবগুণ্ঠিত কপোলের রক্তিমাভার ঊর্ধ্বে নীলকমলের মত যদি জেগে ওঠে তার দু'টি স্বপ্নায়িত আঁখি! আলুলায়িত কেশবাসের পাশে ভুজদ্বয় যদি বিলম্বিত হয় জানু পর্যন্ত! কনকচাঁপার মত যদি হরিদ্রাভ দেখায় অঙ্গুলীগুচ্ছ! যদি বন-কুসুমের আভরণে

সেই মানসীর ঈষদুন্মুক্ত দেহ-লাবনি হয় আরো রশ্মিময়!—তবে? তবে, কত কবি, কত শিল্পী স্তব করবে সে স্বপ্নময়ীর। আপনাকে উজাড় করে ঢেলে দেবে ওই অপরূপ সৌন্দর্যের সুকান্ত অনুভূতিতে।

কিন্তু হিমালয়! তরল মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে এই যে কনকাঞ্জিত শ্বেত-শান্তশ্রীর অপূর্ব সুষমা! এর কি তুলনা দেব?

নারীর সাথে এইরূপের তুলনা হয় না। আদিগন্ত আকাশের নির্মুক্ত নীলিমার পাশে এনে কি বসানো যায় সীমিত আঁখি-দ্বয়ের নীলাঞ্জন স্পর্শটুকু।

এ তুলনা আমি করবো না। হিমালয়ের এই শ্বেত-শান্তশ্রীর কোন তুলনা নেই। সুন্দর এখানে আপনার ঐশ্বর্যে আপনিই বিলীন। উপমার কুল ভেঙ্গে দিয়ে আপনি অনুপম।

হিমালয়ের রূপে তন্ময় হয়ে এগিয়ে চলেছি। উঠছি ধীরে ধীরে। উপরের শিখর নিচে নামছে। আকাশের উত্তরাঙ্গন বিস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

উন্মুক্ত আকাশের বুকে অকস্মাৎ ভেসে উঠলো একটি স্বর্ণশিখা। আরও উঠছি।

শিখাটি বিলম্বিত হলো একটি সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে।

আরও উঠছি পর্বত শিখরে। দণ্ড এসে স্থির হলো একটি প্রস্ফুটিত শিলা-কমলের বুকে।

উঠছি…আরো উপরে।

সমস্ত উত্তর দিকটাই এবার খুলে গেলো নির্মুক্ত আকাশে। তার বুকে জেগে উঠলো একটি মন্দির!

দু'পাশে শ্যামায়িত গিরিশ্রেণী। বামে শত ধারায় উৎসারিতা মন্দাকিনী। পিছনে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত উত্তুঙ্গ বিসরণ। আর মাথার উপরে চাঁদোয়ার মতো টাঙ্গানো রয়েছে একখণ্ড

নীলাকাশ। ওঁরই সীমিত অঙ্গনে ভেসে রয়েছে একটি অনাবৃত শিলা-মন্দির।

এই উত্তরাপথের কেদারনাথ!

সমস্ত মন যেন বিহ্বল হয়ে গেলো। একটি শিলাগৃহ মাত্র! তা-ও যে এত সুন্দর হতে পারে!

বহুক্ষণ বসে রইলাম পাথরের গায়ে!

হিমালয়ের এমনি একটি অপূর্ব পটে যিনি প্রথম এমনি একটি মন্দিরের কল্পনা করেছিলেন তাঁর কথা ভাবতেও মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কত গিরি-দরি-বনাঞ্চল পার হয়ে তাঁর অশান্ত আত্মা সন্ধান করেছিল এমনি একটি অনুপম তীর্থভূমিকে।

পূজা করেই মানুষ যেন ক্ষান্ত নয়, সুন্দরের মধ্যে প্রিয়তমকে পরম সুন্দরের বেদিতে বসিয়ে তবে তার তৃপ্তি।

বাকী পথটুকুতে ওঠা-নামা নেই। সবটা রাস্তাই প্রায় সমতল রেখায় গিয়ে মিলেছে কেদারনাথে।

কেদারনাথে গিয়ে পৌঁছতেই আকাশ একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেলো। পাণ্ডারা বললে, এটা নাকি পরম ভাগ্য। কারণ, এই বর্ষার দিনে কদাচিৎ কেদারনাথের আকাশ পরিষ্কার থাকে।

খোঁজ করে গিয়ে উঠলাম নেপালী ধর্মশালায়। এটাই কেদারনাথের সবচেয়ে ভালো ধর্মশালা। পরিষ্কার পাকা ঘরে একটা খাটিয়াও পাওয়া গেলো, আগুন জ্বালাবার পাত্রও আছে খাটিয়ার পাশে। কেদারনাথে হাড় কাঁপানো শীত। একে প্রায় বারো হাজার ফিট উঁচু। তার উপরে কাছেই উত্তরে আকাশ জুড়ে বিস্তারিত রয়েছে বরফ ঢাকা গিরিমালা। যে গরম জামা কাপড় এনেছি তাতে শীত কুলানো মুস্কিল। ক'টা কম্বল ভাড়া নিয়ে

কিছুক্ষণ তার আবেষ্টনে গরম হয়ে আর কিছু হালুয়া-পুরীতে উদরাগ্নি স্তিমিত করে তবে বেরুলাম কেদারপুরী দেখতে।

চারদিকে পাহাড়। মাঝখানে কিছুটা সমতল ভূমি। উত্তরে দক্ষিণে বিলম্বিত। ডাইনে ও বাঁয়ের পাহাড়ে তৃণ ও পুষ্পের আচ্ছাদন। উত্তরে বরফ-ঢাকা গিরিমালা। দক্ষিণে মন্দাকিনীর চলার পথ অনেক দূর অবধি দেখা যায়। উত্তরের হিম পর্বতে মন্দাকিনীর উৎস। মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে দেখা যায়, পাহাড়ের হিমস্তর থেকে বহুধারায় নেমে আসছে মন্দাকিনী। অসম্বৃত অলক-গুচ্ছের মত। ডাইনে থেকে আরো একটি বড় ধারা এসে মিশেছে। পর্বতটি ঢালু হয়েগেছে ধীরে ধীরে। সমস্ত পর্বতে শুধু বরফ আর নগ্ন পাথর। হিমচাপ ক্ষণে ক্ষণে শিখর থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ও ভেঙ্গে পড়ছে বড় বড় স্তূপাকারে। পর্বতের মাঝখানে কোথাও হিমচ্যুত পাথর, কোথাও বরফ—সাদা-কালোয় আলোছায়া যেন মাখামাখি হয়ে আছে। পর্বতের নিচে বিখণ্ডিত পাথরের বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ। এই ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে ফাঁকে অঙ্কিত রয়েছে মন্দাকিনীর শতধা উৎস। এই সব উৎসই একটি ধারায় সম্মিলিত হয়ে কেদারনাথের পাশ দিয়ে নেমে গেছে মন্দাকিনী নামে।

সবকিছু মিলে মনে হবে যেন প্রকৃতির একটি অনুপম পটে বাঁধানো রয়েছে কেদারনাথের মন্দিরটি।

কেদারনাথ অনেকের মতে উত্তরাখণ্ডের প্রাচীনতম মন্দির। পুরাণে বলে, এ মন্দির পাণ্ডবেরা তৈরী করেছেন। স্বর্গারোহণে যাত্রার পূর্বে পাণ্ডবেরা এখানে এসেছিলেন। পুরাণের মতে সর্বপ্রথম এখানে শিবপূজা করেন উপমন্যু। আর ঐতিহাসিকেরা বলেন,

কেদারনাথের মন্দির পুনঃসংস্কার করেছেন শঙ্করাচার্য। এবং অনেকের অভিমত তাঁর দেহত্যাগও এখানেই হয়েছে।

মন্দিরটি প্রাচীন ভারতীয় শৈলীতে গঠিত। চূড়ায় একটি পদ্ম এবং পদ্মের বুকে একটি ধাতু-নির্মিত দণ্ড। মন্দির-প্রাঙ্গণে বৃষভ মূর্তি আছে এবং তোরণে ঝুলানো রয়েছে একটি বৃহৎ ঘণ্টা।

কেদারনাথের মন্দির যে খুব প্রাচীন দেখলেই তা বোঝা যায়। শত শত বছরের জলবায়ুর প্রকোপে মন্দিরের কঠিন শিলাখণ্ডগুলি ক্ষয় হয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। সমস্ত মন্দিরটি ঘিরেই কালপরিক্রমণের সুস্পষ্ট চিহ্ন। মন্দিরের আশেপাশে অনেক কারুকার্যময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা শিলা পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয়, এগুলি হয়তো কোনো পুরানো মন্দিরের অবশেষ। পাণ্ডাদের চোখে এসব ভাঙ্গা শিলার কোন মূল্য নেই। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধানে এ পাথরগুলিই হয়তো একদিন অতীতের বিস্মৃত দুয়ার খুলে দেবে।

মন্দিরের বাইরে ও ভিতরে অনেক দেবমূর্তি আছে। পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি রয়েছে মন্দিরের বহিরাঙ্গনে। তা ছাড়াও অতি সুন্দর শিবমূর্তিও রয়েছে নানা অভিব্যক্তিতে।

কেদারনাথের মূল বিগ্রহ কোনো মূর্তি নয়, —একটি সুবৃহৎ শিলাখণ্ড। এই শিলাখণ্ডের উপরে মানুষের হাত ছুঁইয়ে কোনো আকার দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। যেমন ছিল তেমনিই আছে।

পুরাণে বলে পৃথিবীর পাপে উত্যক্ত হয়ে একসময় শঙ্কর এই শিলাখণ্ডের রূপ ধরে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার উদ্যোগ করেছিলেন। তৃতীয়পাণ্ডব ভীমসেন এমন সময় শঙ্করদেবকে নিজের বাহুবলে অতলগমনে নিরস্ত করেন। এবং এ কাজ করে কুরুক্ষেত্রের স্বগোত্রহত্যার মহাপাপ থেকে মুক্তি পান।

উত্তরাখণ্ডের ধর্ম ব্যাখ্যানে কথিত কেদারনাথের বাঁহু তুঙ্গনাথে, নাভী মদমহেশ্বরে, জটা কল্পেশ্বরে এবং মুখ রয়েছে রুদ্রনাথে। এইজন্য কেদারনাথকে কেন্দ্র করে এই তীর্থ কয়টি পঞ্চকেদার নামে পরিচিত।

সন্ধ্যায় আরতি শুরু হলো।

দলে দলে মন্দির প্রদক্ষিণ করছে ধর্মার্থী তীর্থযাত্রীরা। ক্রুপদের গম্ভীর সুরে বেদমন্ত্র পাঠ করছেন কয়জন পুরোহিত। পূজারীর বাঁ হাতে ঘণ্টা, ডান হাতে পুষ্পময় দীপাধার। মন্দিরের সুরভিত অভ্যন্তরে আধো আলো, আধো অন্ধকার। ধূপশিখায় আলোক-তরঙ্গ। পূজারী দোলায়িত করে আরতি করছেন কেদারনাথের।

যাত্রীরা আসছে করজোড়ে। ফুল পাতা নিবেদন করছে মন্দিরাঙ্গনে। কেদারনাথে কোনো ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নেই। মন্দিরের ভিতরে গিয়ে যাত্রীরা শিবলিঙ্গ স্পর্শ করছে। আর করজোড়ে প্রদক্ষিণ করছে সেই শিলাময় বিগ্রহকে। আনন্দে ভক্তিতে তাদের চোখে মুখে প্রেমাশ্রুর প্লাবন। কণ্ঠে কত স্তোত্র, কত বিচিত্র ভজন-সঙ্গীত। আর অবিরাম কেদারনাথের জয়ধ্বনি।

ভগবান আছেন কিনা জানি না। কিন্তু মানুষের এই বুক-ঢালা প্রেমোৎসর্গের যেন কোন সীমা পরিসীমা নেই।

ভেবেছিলাম মন্দাকিনীর উৎস ঘুরে আসবো এবং দেখে আসবো হিমাচ্ছাদিত পর্বতের ধ্বংসস্তূপ। তা ছাড়া সামনের পাহাড়ের কোলে নাকি একটা খুব বড় গুহা আছে। সে গুহার সামনে পাণ্ডবেরা যজ্ঞ করেছিলেন স্বর্গারোহণের পূর্বে। এখানকার লোকেরা বলে, ওখানে পাথর খুঁড়ে সন্তর্পণে অনুসন্ধান করলে এখনো নাকি যজ্ঞে ব্যবহৃত বড় বড় তিল, যব ও অঙ্গার পাওয়া যায়। এমনি তিল ও যব এখানে সত্যি কেউ পেয়েছে

কিনা তার অবিশ্যি কোনো প্রত্যক্ষ প্রমান পাইনি। কিন্তু এখানকার পূজারীদের তাই বিশ্বাস। নিজে এসব পরখ করে দেখবার জন্য খুবই কৌতূহল জেগেছিলো। মন্দাকিনী যেদিক দিয়ে উৎসারিত হয়েছে, পাহাড়ের সেদিকে দুটো সরোবর আছে। এবং সে সরোবর দুটিতে ব্রহ্মকমল ফুটে থাকে। ওখানে যাব প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা বিশেষভাবে নিষেধ করলেন। বর্ষাকালে ওখানে যাওয়া খুবই বিপদ। কখন আকাশ বাদল ও কুয়াশায় ঢেকে যায় তার ঠিক নেই। পাহাড়েব গা থেকে সেখানে অবিরাম পাথর ভেঙ্গে পড়ছে। কুয়াশার অন্ধকারে কখন এবং কোথা দিয়ে যে পাথব স্তূপ গড়িয়ে পড়বে তারও কোনো স্থিরতা নেই। আর, একটি পাথর কোনক্রমে একবার গায়ে এসে পড়লে যাত্রীকে ওখানেই সমাধিস্ত হতে হবে। তাই ওখানে যেতে হলে হয় বর্ষার আগে, নয়তো তার পরে। নিরুপায় হয়ে তাই পাহাড়ের কিছুটা কাছাকাছি গিয়ে দূব থেকেই হিম-পর্বত দেখার আশা মেটাতে হলো! কোনো গাইড বা পাণ্ডা পাওয়া গেল না।

কেদারনাথে স্থায়ী সাধু বেশি নেই। একজন আছেন সদামৌনী। আরেকজন প্রায় বাইশ বছর যাবত থাকেন এখানে। শীতকালের ছয়মাস উখীমঠে যখন কেদারনাথের পূজা হয় তিনি তখন গৌরীকুণ্ডে নেমে যান। বেশ বৃদ্ধ। চোখেমুখে সৌম্যশ্রীর স্নিগ্ধ প্রশান্তি। কোনো আড়ম্বর নেই। যেমন সাদাসিধা জীবন তেমনি ধর্মালোচনাও করেন সাদাসিধা ভাবে। লোকেরা খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে তাঁকে।

আরেকজন সাধু থাকেন কেদারনাথ থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে এক পাহাড়ের গুহায়। সেই গুহাটির সামনে কিছু জায়গায়

পাথর খুঁড়ে আলু বোনেন। সেই আলুই তাঁর একমাত্র আহার। কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন না। সবাই তাঁর কঠোর সাধনার কথা বলে। কিন্তু তাঁর বাইরের ভাব এমন প্রচ্ছন্ন যে বোঝা মুস্কিল।

কেদারনাথের কয়েক মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি নেই। মন্দিরের সামনে শুধু কয়েকটি ধর্মশালা। আর আছে পাণ্ডাদের কিছু ঘর এবং দোকান। শীতের দিনে কেদারনাথে সব বন্ধ। কয়েক মাইল ঘিরে এত বরফ পড়ে যে মানুষের পক্ষে তখন সেখানে বাস করা অসম্ভব।

দেড়দিন কেদারনাথে থেকে আবার চলতে শুরু করলাম ফেরার পথে। ভেবেছিলাম নামার পথে তর্ তর্ করে অল্প সময়ের মধ্যেই নিচের দিকে নেমে যাব। কিন্তু পাহাড়ী পথ যেন শাঁখের করাত। দু'দিকেই কাটে। উঠতে চাপ লাগে হাঁটুর মাংসপেশীতে। নামতে লাগে কোমরে। লাঠির উপর জোর দিয়ে ব্রেক কষে কষে তবে নিচের দিকে পা বাড়াতে হয়।

যে পথে গিয়েছি সে পথেই ফেরা। নতুনত্বের অভাবে তাই আত্মমন হয়েই নামতে হয় নিচের দিকে। পথে পথে নবাগত যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। যাওয়া-আসার মুখে যাত্রীরা অভিনন্দন বিনিময় করে। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের জয়ধ্বনি হল এ অভিনন্দনের বাণী। যে ফিরছে তার চোখে আনন্দ। যে উঠছে তার আগ্রহ। দুজনেরই পরম তৃপ্তি। ভারতের কোন্ প্রান্ত থেকে কে এসেছে, ক'জনই বা কার ভাষা বোঝে! তবু কত পরিচিতের মত যাত্রীরা সম্ভাষণ করে যায় পরস্পরকে।

চলার পথে স্থানে স্থানে এসে পাহাড়ী ছেলেমেয়ের দল কল-

কোলাহল শুরু করে দেয়। নবাগত যাত্রী এলেই দৌড়ে এসে ঘিরে দাঁড়ায়। ছোট ছোট টুক্‌টুকে সব ছেলেমেয়েরা। দুর্বোধ্য ভাষায় কল কল করে শুরু করে কেদার-বদ্রীর স্তোত্র-সঙ্গীত আর হাত তুলে নেচে নেচে বলে,—'ও শেঠজী, পাই-পয়সা! ও শেঠজী, পাই-পয়সা!'

পাই-পয়সা কবে উঠে গেছে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে পাই-পয়সা চাওয়ার রীতি এখনো ওঠেনি। অবিশ্যি পাই-পয়সা না চললেও এ পথে আধ-পয়সা এখনো চলে। একটি করে আধ-পয়সা দিলেও এই ছেলে-মেয়েরা কি খুশি! মাত্র আধ-পয়সা, কিবা তার দাম! কিন্তু তবু এই গোলাপ-কুঁড়ির মত ফুটফুটে সুন্দর ছেলেমেয়েরা একটি করে আধ-পয়সা পেয়ে যেভাবে কল কল করে স্তোত্র সঙ্গীত গেয়ে ওঠে, তা'তে ওই আধ-পয়সার গায়েও যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে যায়। যতীন মহারাজের লজেঞ্জস্ আর দু'পকেটভরা আধ-পয়সাগুলি যেন পথে পথে আনন্দের ফোয়ারা বইয়ে দিল।

পাণ্ডা ও দোকানীরা তীর্থযাত্রীদের মন ভুলাবার কৌশলে অদ্ভুত পারদর্শী। দোকানীদের চেয়ে পাণ্ডাদের কৃতিত্ব বেশি। কত ব্যাখান-উপাখ্যান শোনাবে। কত কাহিনী, কত অলৌকিক গল্প বলবে। মাঝে মাঝে উচ্চারণ করবে শাস্ত্রবাণী ও বেদমন্ত্র। বলবে,—তীর্থস্থানে এসেছেন কত কষ্ট করে, কত ভাগ্যের বলে। ব্রাহ্মণকে দান-ধ্যান করা, কুণ্ডে কুণ্ডে তর্পণ করা, পিতৃ-পিতামহদের পিণ্ডদান করা—একি কম কথা!

কোন্ কোন্ দেবতা, কোন্ কোন্ মুনি-ঋষি এই সব তীর্থস্থানে সাধন-ভজন ও তর্পণাদি করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, কোথায় কোথায় হর-পার্ব্বতী ও লক্ষ্মী-নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছে,

কোথায় পাণ্ডবরা পুজা-অর্চ্চনা করেছেন—এমনি সব পৌরাণিক কাহিনী অনর্গল বলে যাবে এবং কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে এমনি শাস্ত্র বাক্য শোনাবে যে গ্রামীন যাত্রী তো দূরের কথা, শহুরে যাত্রীরা পর্যন্ত সম্মোহিত না হয়ে পারবে না।

এমনি সব কথার বিনুনিতে আবার সম্ভাষণের বৈচিত্র্যও আছে। কখনো যাত্রীকে সম্ভাষিত করবে 'মহাত্মা' বলে, কখনও 'মহারাজ' বলে। বেশভূষায় একটু সুবিন্যস্তভাব দেখলে স্বরগ্রাম দুলিয়ে দুলিয়ে বলবে,—ও শেঠজী, ও লালাজী, নয়তো প্যাটেলজী, সর্দারজী, বাবুজী। বাক্যের এমনি আবর্তন-বিবর্তনে যাত্রীদের মনকে আকৃষ্ট করে যে কত ঘাটে কত পটে কত দক্ষিণা আদায় করে নেয় এসব পাণ্ডারা তার হিসেব নেই।

কেদারনাথ থেকে দুপুরে রওনা হয়ে আবার মন্দাকিনীর পার ধরে একেবারে বারো মাইল চলে এলাম বিকেলবেলা। গৌরী কুণ্ড পড়লো পথে। একটি উষ্ণজলের উৎস আছে এখানে। অবিরাম গরম জল উঠছে পাহাড়ের ভিতর থেকে। যাত্রীরা এই উষ্ণ গৌরীকুণ্ডে স্নান করে। কেদারনাথের ঠাণ্ডার পরে এখানে স্নান খুব আরামের।

গৌরীকুণ্ডের মন্দিরটি সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর মন্দিরটির অবস্থান। একেবারে মন্দাকিনীর গা ঘেঁষে মাত্র কয়েক হাত উঁচুতে দাঁড়িয়ে। একটা বিরাট পাথর পড়ে রয়েছে পার্শ্ববর্তী খরস্রোতার বুকে। মন্দাকিনীর দুরন্ত স্রোতধারা এই পাথরের গায়ে এসে বরাবর ধাক্কা খেয়ে তুমুল গর্জনে ফেটে পড়েছে চারদিকে। দু'দিকে পাহাড়, মাঝে উচ্ছলা মন্দাকিনী। তারই প্রায় সমান্তরাল ভূমিতে গৌরীকুণ্ডের এই মন্দিরটি এখন একটি প্রাকৃতিক আবেশ সৃষ্টি করে যা যাত্রী-মনকে সহজেই আকর্ষণ না করে পারে না।

গৌরীকুণ্ড পার হয়ে পুরানো পথেই ফিরে চলেছি। সঙ্গী শুধু নেপালী কুলিটি। ভাঙ্গা হিন্দী আমাদের যোগসূত্র। ও-ই রান্না করে। সেই পরম পাচ্যই উদরের সাগ্নিক গহ্বরে ঢেলে দিই। এমন সুবেশ ও সুপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিটির হাতে এক গ্লাস জলও কারো মুখে রুচতো কিনা সন্দেহ, যদিনা সে হতো এই দুর্গম পথের সহযাত্রী। পনের কুড়ি দিনেও স্নানের বালাই নেই। তার শুকনো গাত্ররসের সুবাস তো সদাই আসছে নাসাবন্ধ্রে। অন্ন-প্রাশনের অন্ন না হোক সদ্যপাচ্য অন্নকে উদ্‌গীরণের বেগ থেকে অতিকষ্টে সংযত করে রাখতে হয় ধনসিংহের সান্নিধ্যে। কিন্তু ও-ই তো এখন সব। রান্না খাওয়া থেকে আরম্ভ করে রাত্রে একহাত দূরে শোওয়া পর্যন্ত।

অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হলেও এই নেপালী কুলীরা বিশ্বাসী এবং যাত্রাপথের নির্ভরশীল সঙ্গী। চলাব পথে ওরই সঙ্গে গল্প করি। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস কবি ওকে দেশের কথা।

বাড়িঘরের কথা উঠলেই বেচারা কেমন নরম হয়ে পড়ে। বড় গরীব এরা। গাঁয়ে কিছু জমিজমা আছে। শুধু ধান আর আলু হয়। এতে জীবন চলে না ওদের। তাই অর্থের সন্ধানে দেশ ছেড়ে বাইরে আসে। দেশ থেকে পাহাড়ী পথ ডিঙ্গিয়ে ভারতে আসতে লাগে অনেক দিন। এক একবার বাড়ি ফেরে চার পাঁচ বছর পরে, কি আরও দেরীতে।

'বাড়িতে তোর কে আছে রে ধনসিংহ,' চলতে চলতে প্রশ্ন করি ওকে।

'বউ, এক ছেলে, এক মেয়ে।' ও নাম তিনটেও যেন এত মিষ্টি যে চুক চুক করে আস্বাদ নিয়ে তবে শব্দ করে ধনসিং।

'খায় কি করে ওরা ?'

'ঘরে কিছু জমি আছে। তাই চাষ করে বউ। বছরে একবার করে টাকা পাঠাই।'

পুরুষরা বহুদিন বাড়ি যেতে পারে না বলে মাঝে মাঝে ওদের ঘরণীদের নিয়ে বিপদ ঘটে। অনেক সময় পরপুরুষের সঙ্গে চলে যায়। দেশে ফিরে গিয়ে যদি ওরা দেখে যে বউ অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে চলে গেছে তাহলে আর সে পুরুষের রক্ষে নেই। খুন-খারাপি অনিবার্য। কিন্তু বউ যদি পঞ্চায়েতের কাছে বলে যে সে স্বেচ্ছায় গিয়েছে তার সঙ্গে তবে পরপুরুষেরই জয়।

ওদের জীবনযাত্রার সব কাহিনী বলে সাদা ধনসিংও একটু রঙ মেখে দেয় কথার শেষে। জানিয়ে দেয় যে বউ সম্বন্ধে সে উদাসীন নয়।

'আমি দুই কি তিন সাল পরে পরেই বাড়ি যাই। মাস ছয়েক পরে পরে কিছু টাকা পাঠাই। আর ছেলেমেয়ে ও বউয়ের জন্যে জামা কাপড় ও চুড়ি……'

কথাটা শেষ না হতেই গালভরা হাসিতে ধনসিংয়ের মুখ ভরে যায়।

অদ্ভুত বিশ্বাসপরায়ণ এরা। কুলির কাজ করে যা জমায় কোনো দোকানীর কাছে রেখে দেয়। কেউ যখন দেশে যায় তার হাতে পাঠিয়ে দেয় জমান টাকা। ডাক যায় না ওদের দেশে। চিঠিপত্র পাঠাবারও কোন সুরাহা নেই। যে লোক টাকা নিয়ে যায় তাকে শতকরা দশ টাকা দিতে হয় মুনাফা।

'টাকা যে দিস লেখা-পড়া থাকে কিছু ? যদি অস্বীকার করে বসে ?' : শহুরে সন্দেহের খোঁচা দিই ধনসিংকে।

এ যেন একটা অতি অসম্ভব কথা,—চোখে এমন একটা বিস্ময়

ফুটিয়ে ধনসিং উত্তর দেয় : 'নঁহী! অ্যাসা নঁহী হোতা। কভী হো নঁহী সাক্‌তা।'

'অ্যাসা নহী হো সাক্‌তা' — এর পরে আর কি প্রশ্ন আছে! রেল কবে যে ধনসিংকে সমতল মাটীতে নিয়ে গিয়ে এর উত্তরটা শিখিয়ে দেবে।

গুপ্তকাশীর কাছাকাছি নেমে এসে পথ দু'মুখো হয়ে গেছে। একটা গেছে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে, আরেকটা তুঙ্গনাথ হয়ে বদ্রীনাথের দিকে।

তুঙ্গনাথের পথ বড় দুর্গম ও কঠিন। খুব চড়াই আব উৎরাই। চটি বা পান্থশালাগুলিও খুব দূবে দূরে। তাই কেদার-যাত্রীরা সাধাবণত তুঙ্গনাথে না গিয়ে সোজা রুদ্রপ্রয়াগে চলে যায়। এবং সেখান থেকে আবার শুরু করে বদ্রীনাথের যাত্রা।

কিন্তু এত কাছাকাছি এসেও তুঙ্গনাথেব আহ্বান এড়াই কি করে? শুনেছি তুঙ্গনাথ উত্তরাপথের সবচেয়ে উঁচু মন্দিব। এবং তুঙ্গনাথ থেকে হিমাঞ্চলের নাকি এক অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়।

তুঙ্গনাথের পথে পা বাড়িয়ে তাই সন্ধ্যেবেলায় এসে পৌঁছলাম উখীমঠ।

উখীমঠ এ অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট মন্দিব। শীতকালের ছয়মাস এখান থেকেই কেদারনাথের পূজা করা হয়। ববফ গলে গেলে পূজাবীরা আবাব ফিরে যায় কেদারনাথে।

এই মন্দিরের প্রাচীন নাম ছিল উষামঠ। উষা উখীতে ভাষান্তরিত হয়েছে। স্থানীয় রাজা বানাসুরেব কন্যার নাম ছিল উষা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ এখানে বেড়াতে এসে গিরিকন্যা উষাকে দেখতে পান। প্রথম দর্শনেই দুজনের মনে দেখা দেয় পারস্পবিক অনুবাগ। অনিরুদ্ধ উষার পাণিপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ান গিয়ে বানাসুরের সামনে। বানাসুর মেয়েকে অনিরুদ্ধের হাতে তুলে দিতে অসম্মত

হলে অনিরুদ্ধের ক্ষাত্র-বীর্য রোষায়িত হয়ে ওঠে। যুদ্ধ বেধে যায় অনিরুদ্ধ ও বানাসুরের মধ্যে। বানাসুরকে নিধন করে উষাকে অর্জন করেন অনিরুদ্ধ। সেই পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করেই এই উখীমঠের আখ্যান।

পিতাকে নির্মমভাবে বিসর্জন দিয়ে যে নারী অনিরুদ্ধের গলায় মালা দিলেন তিনি দেবী হলেন কি করে? শুধু কি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রবধূ বলে? প্রেম কি তবুও পূজা পায়—যদি ধ্বংস ও মৃত্যুর শত অশ্রু বইয়ে দিয়েও সে আসে!

উখীমঠে ঢুকবার আগেই পথপ্রান্তে কতগুলি ছোট ছোট মঠ পড়ে আছে। কোন কোনটায় শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য মূর্তিও আছে। কিন্তু কোন যত্ন নেই বলে এই ছোট ছোট মঠ ও মূর্তিগুলি ভেঙ্গে-চূরে পড়ে রয়েছে এধারে ওধারে।

উখীমঠের প্রধান মন্দিরটি অতি সুন্দর। বেশ উঁচু এবং ভিতরের প্রাঙ্গণটি পরিচ্ছন্ন। ভিতরে আরো কয়েকটি মন্দির আছে। মন্দিরের প্রধান মূর্তি শিবলিঙ্গের। আশেপাশে মন্দিরের গায়ে এবং মন্দিরের মধ্যে আরো অনেক মূর্তি আছে। পঞ্চপাণ্ডব, হনুমান, গণেশ ইত্যাদি ছাড়াও হর-পার্বতী ও বিষ্ণুর নানা মূর্তিও রয়েছে। মন্দির-অভ্যন্তরের অনেক মূর্তি বস্ত্র ও পুষ্পাবৃত বলে সব ভাল করে দেখা যায় না। আর সব যায়গার মত এই মূর্তিগুলিও অতি সুন্দর ও নিখুঁত। মন্দিরেব ইতিহাস কেউ বলতে পারে না। তবে এই মন্দিরটিও কেদারনাথের শৈলীতে রচিত এবং বোধহয় উত্তরাখণ্ডের একটি অন্যতম সুন্দর মন্দির।

উখীমঠে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায় রওনা হ'লাম তুঙ্গনাথের দিকে। যেতে হবে প্রায় চৌদ্দ পনের মাইল। ভাবলাম অনায়াসে এই কয় মাইল আজই পার হয়ে তুঙ্গনাথ ছাড়িয়ে গিয়ে বদ্রীনাথের

পথে এগিয়ে থাকব। তুঙ্গনাথ খুব উঁচু বলে শীতও খুব বেশি তাই যাত্রীরা এখানে রাত্রে বড় কেউ থাকতে চায় না, সকালে তুঙ্গনাথে ওঠে, বিকেলে নেমে আসে নিচের চটিতে।

তুঙ্গনাথের পথে সহযাত্রী পাওয়া গেল এক সাধুকে। তিনিও চলেছেন তুঙ্গনাথের দিকে। সাধুর কাপড়ে গেরুয়ার চড়া রং নেই। অতি হালকা গেরুয়ায় ছোপান এক টুকরা অঙ্গবাস মাত্র। সাধু মারাঠী। হায়দ্রাবাদে বাড়ি ছিল। নাথপন্থী। মুখভরা দাড়ি। চুলও বড় বড়। নিজেকে সাধু বলে বোঝাবার বিশেষ প্রয়াস নেই।

একলা-পথই কথা কইয়ে দিল সাধুর সঙ্গে। পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে সাধুও ক্ষুব্ধ। গেরুয়া-পরা যাত্রীদের অবশ্যি পাণ্ডারা কিছু বলে না। কারণ ওসব নেংটী সর্বস্বদের কাছ থেকে পাবে না তো কিছুই।

'মন্দিরতো পাণ্ডাদের কাছে দেবমন্দির নয়, যেন কারবারের আড়ত। গ্রামীন যাত্রীদের কাছ থেকে স্নান-দান-দর্শনের নামে যত ভাবে পারে পয়সা আদায় করে নেওয়াই পাণ্ডাদের কাজ': সাধুর কণ্ঠেও আক্ষেপ।

সাধুর ভাষায় অনুরণনের সাড়া পেয়ে আমি তো প্রায় বক্তৃতাই শুরু করে দিলাম: 'ঝগড়া করতেই যেন এলাম এখানে। যেখানে যাই সেখানেই ঠোকাঠুকি। পাণ্ডারা নাছোড়বান্দা, এখানে দাও, ওখানে দাও। কুণ্ডে কুণ্ডে স্নান করো। দেব-মাহাত্ম্য শোন।...দাও আর দাও।...ওসব 'বরহমনদের' লোভের ইন্ধনে ঘি দিয়ে লাভ কি? এই হিমালয়েও যদি সেই আচার-সংস্কার আর পাণ্ডাদের অর্থের বেসাতি......'

সাধুরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়। প্রতি কুণ্ডে স্নানও করে। ভিক্ষার্থ থেকেই ব্রাহ্মণকে কিছু দক্ষিণাও দেয়। সর্বস্থান থেকে

করপুটে গ্রহণ করে চরণামৃত। এসব অবর্ম কথা কি সাধুর ভাল লাগবে। ভাবতে ভাবতে উৎসুক চোখে সাধুর দিকে তাকাই।

'তীর্থে কি দেব-দর্শন মেলে?—মেলে সম-দর্শন। সাম্যভাব আসে মনে। 'আমি' আর অহংকারের মাত্রা কাটে। মায়াবন্ধন শিথিল হয়। কুণ্ডে এসে যদি স্নান দান করলেই পুণ্য হয়ে যেতো তবে তো তীর্থদর্শনই হতো। যত সব পাপ কাজের মুক্তি। খুব পাপ করো, শুধু কুণ্ডে কুণ্ডে এসে একটা ডুব দিয়ে যাও। আরে অ্যাসা হোতা কভী?" স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন সাধুজী। খুব ভালো লাগলো সাধুর উত্তরটি।

বলে চললেন আরও সাধুজী তীর্থভ্রমণে কি হয় যদি না মনের ময়লা কাটে?

আপ আপকো খোয়া নহী
মন মৈলে কো ধোয়া নহী
গয়া নাহে তো ক্যায়া হুয়া?
করণী করে বদ কাম কি
নজর রাখে হারাম কি
দ্বারকা গয়ে তো ক্যায়া হুয়া?

মানে করে সাধু বুঝিয়ে বলেন: যে নিজেকে জানেনি, নিজের মনের ময়লা ধুয়ে মুছে ফেলেনি' গয়াধামে গিয়ে সে যদি স্নান করেই বা এলো তাতে এমন কি হলো? যে শুধু বদ কাজ করে আর হারামের দিকে যার সর্বদা চোখ, সে যদি দ্বারকায় তীর্থ দর্শনে যায় তা হলেই বা এমন কি আসে যায়?'

গেঁয়ো কবির গেঁয়ো কথা, কিন্তু কত গভীর তার মর্মার্থ!

'বাইরে থেকে শত ফুল-চন্দন দিয়ে সাজালেও কিছু হয় না। শত দান-দক্ষিণাও অর্থহীন। বহু তীর্থভ্রমণেও কোন ফল নেই। যদি না মনের অনুভূতিতে ঘটে রূপান্তর।

সাধু আপন মনেই বলেন : 'পূজা-অর্চ্চনায় কি হবে ? শত শত টাকা খরচ করে উৎসব করেই বা লাভ কি ? ভগবান কি টাকার দাস না দানের ভিখিরী।'

আমার দিকে একবার চেয়ে আবার নিজেই বলে চল্লেন : 'বড়লোকের অহমিকা দেখেছো ? মন্দিবের তোরণ তৈরি করে দিয়েছে তো নিজের নামটি লিখে রাখতে ভোলেনি। বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে প্রাঙ্গণ, আর সবটাতেই নাম লিখে রেখেছে নিজেদেব। কেউ আবার এসে সোনার গয়না, রূপাব গয়না দিচ্ছে বিগ্রহকে। দেব-দক্ষিণা দিচ্ছে কত টাকার। তা আবাব লিখিয়ে রাখছে পাণ্ডাদেব খাতায়। ...আরে ক্যায়া পবমাত্মা রূপায়া মাঙ্গতা ? ধন দৌলত ? ক্যায়া কুছ কাঞ্চন ? ...ভগবান প্রেমেব ভিখারি। প্রেমকি ভূখ। যার অন্তরে প্রেম আছে, কি প্রয়োজন তাব ধনরত্ন, দক্ষিণা আব কুণ্ডে কুণ্ডে অবগাহনেব !'

যেন আপন মনেই মগ্ন হয়ে কথা কয়ে চলেছেন পবিব্রাজক সাধু। বক্তব্যটি বুঝাবাব জন্য আবাব সেই গেঁয়ো কবিব আবৃত্তি শোনালেন :

চন্দন তেরে চুটকী ভৈলি
ক্যায়া কবনা বাবুল কি শাল ?
সজ্জন তেরে ঝোপরি ভৈলি
ক্যায়া করনা দুর্জন কি মহাল ?

বাবুল গাছ কত বড়, কত বিশাল। কিন্তু ওই বিশাল বাবুল দিয়ে কি হবে ? ছোট এক টুকরা চন্দন, কিন্তু কি মিষ্টি তার গন্ধ। গৃহস্বামী যদি হয় দুর্জন কে যায় তার বিরাট অট্টালিকায় ? সজ্জন ব্যক্তির যে ছোট্ট কুটীর তা-ও কত ভাল।

'ভগবানের কাছে ধন-মান নয়—অন্তবেব প্রেম ও ভক্তিই হলো আসল অর্চনা।'

এগিয়ে চলছি সাধুর সঙ্গে। মনের আস্তরণে গিয়ে স্পর্শ করলো ওঁর কথাগুলি। সত্যিই তো ভগবানের সঙ্গে যদি মানুষের সহজ সম্বন্ধ না হলো তবে আর ভগবান কি ?

একটুও কৃত্রিমতা নেই সাধুর কথায়। পাহাড়ী ঝরনার মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছে যেন কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে। প্রতিটি কথার শেষে তাঁর ঠোঁট দুটিতে ফুটে উঠছে একটি অনুপম বাণী ঃ আনন্দ্‌! আনন্দ্‌!

'আনন্দ্‌' কথাটি সত্যি এমন আনন্দ দেয়! সাধুজীব সহজ মনোভাবে অজ্ঞাতসারে তাঁর সহযাত্রী হয়ে পড়লাম। এতদিন একা একাই চলছিলাম, এবার একজন সঙ্গী পেয়ে যেন খুশি হয়ে উঠলো মনটা। সাধুর বয়স হয়েছে ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু দেহ বলিষ্ঠ। পথ চলার একটুও ক্লান্তি নেই।

হিন্দী জানেন কিছু কিছু। ইংরেজী শিক্ষা নেই একটুও। আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয়ও খুব কম। কিন্তু পাহাড়ী পথে আধুনিকতার গিল্টি- করা জৌলুস আর নাই-বা হলো। জীবনে তথাকথিত সংস্কৃতি-সুরুচির হাবুডুবু তো আর কম নেই। প্রকৃতিব অবারিত অঙ্গনে সহজ ভাষাই আমাদের সম্বন্ধকে সহজ করে দিলো। এই বৈরাগী সাধু হলেন বদ্রীনাথের পরম সহযাত্রী।

পাঁশাপাশি চলতে চলতে কৌতূহল জাগে সাধুর জীবন-কথা নিয়ে। সাধুরও কোন দ্বিধা নেই। ওর কাছে গোপন অগোপন যেন দুটোই সমান।

জিজ্ঞেস করে জানলাম, সাধুজী এক সময় সেনাবিভাগে কাজ করতেন। ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। বছর কয়েক হলো সন্ন্যাস নিয়েছেন। তাঁর গুরু হায়দ্রাবাদেই থাকেন। একশ' বছরের বেশি তাঁর বয়স। তিনি কোন আচার-সংস্কারে বিশ্বাস করেন না। ভক্তি আর ভজন—এই তাঁর ধর্মাচার। সন্ন্যাস নেওয়ার পর

থেকে সাধুজী ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দ্বারকা, কন্যাকুমারিকা, বৃন্দাবন, নীলাচল—সব ঘুরেছেন নানা তীর্থস্থানে। এবার কেদার-বদ্রী ঘুরে কৈলাস তাঁর গন্তব্য স্থল।

আসবাবপত্র সাধুর বিশেষ কিছুই নেই। একখানা অতি সাধারণ কম্বল। একটা অতিরিক্ত কৌপিন ও মৃগছাল। আব ধূম-পানের একটি পুঁটলী। এই সাধুর সম্পত্তি।

তীর্থে তীর্থে যে ঘুরে বেড়ান—পথের কড়ি?

যেন প্রশ্নের খোঁচা খেলেন সাধুজী।

'আনন্দ্! আনন্দ্! সাধুদের কি বাধা আছে কিছুতে। রেলে চড়ি, কিন্তু টিকিট নেই। কোথাও নামিয়ে দেয় তো হাঁটতে শুরু করি। কখনো কেউবা টিকিট কিনে দেয়। কেউবা কখনো সঙ্গে করে নিয়ে যায়। সবই শ্রীগুরুর ইচ্ছে।'

পেট ত আর পথ নয় যে চল্লেই হল?

তুলে ধরি দ্বিতীয় প্রশ্ন সাধুজীর সামনে।

'সাধুর আহার?' একবেলা চাউল কি রুটি খাই—ভিক্ষাতে যা মিলে। বাতে যদি কোনদিন মিলে তো ভাল, নইলে এমনিতেই চলে যায়। কোন কোনদিন কিছুই মেলে না। শ্রীগুরুর জল খেয়ে গাছের পাতা খেয়ে বড় আনন্দে দিন কেটে যায়। একবার তো এক পাহাড়ে কয়দিন পাতা খেয়েই ছিলাম। জন্তুরা পাতা খেয়ে থাকতে পারে তবে আমরা পারবো না কেন?'

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সাধুজীর কথায় যেন পুরো বিশ্বাস হলো না। কিন্তু অবিশ্বাসই বা করি কি করে! ধর্মসাধনায় তিনি কতদূর এগিয়ে গিয়েছেন তা জানি না, বুঝিও না। কিন্তু সাধুজী জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। থাকা-খাওয়া নিয়ে কোন ভাবনা নেই। জীবনের সমস্ত অনুভূতিকে একটা সহজ আনন্দের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। এই তাঁর আকাঙ্খা ও অবলম্বন।

দেখতে এই অতি সাধারণ লোকটির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম খাওয়া-পরা আর বিলাস-ব্যসনের সমস্যা নিয়েই তো সভ্যতার যত মারামারি। আর এ লোকটির তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও উদ্বেগ নেই।

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করি সাধুজীকে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা তুলি : বিয়ে করেছেন, ছেলেপিলে রয়েছে তবুও ঘর ছাড়লেন কেন ?

'কি করবো ! ভাল লাগছিল না কিছুই। স্ত্রীকে আমি বলেছি সে কথা। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে পরীক্ষা করে দেখেছি এ বৈরাগ্য মনের ভ্রম কিনা। তিন বছর ব্রহ্মচর্য নিয়ে ঘরেই ছিলাম। তারপর চলে এসেছি।'

আমার আধুনিক মন যেন উষ্ণ হয়ে উঠলো তাঁর কথায়। মেয়েরা যেন একটা প্রাণহীন জড়পিণ্ড। ইচ্ছে করলেই নেওয়া যায় আর দরকার না হলেই ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়। একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বললাম : আপনার বৈরাগ্য এলেও আপনার স্ত্রীর তো বৈরাগ্য নাও আসতে পারে ? আপনি তাঁকে বিয়ে করে এনেছেন। তাঁর প্রতি কি দায়িত্ব নেই আপনার ? শাস্ত্রে না স্ত্রীর নাম দিয়েছে সহধর্মিনী বলে ? ঘরে থেকেও কি সাধুজীবন যাপন করা যায় না ?

সাধুজীর উত্তরে কিন্তু উষ্ণতা নেই : 'হ্যাঁ, ঘরে থেকেও সাধু হওয়া যায় বই কি ? একদিন পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহেশ্বর তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে ? উত্তরে মহাদেব বললেন 'যে সংসারে থেকেও সাধুর জীবন যাপন করে সেইই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।'

'কিন্তু'···সাধুজী যেন ক্ষণিকের জন্য করুণ নয়নে তাকালেন আমার দিকে। ······'সংসারে থেকে সাধু হওয়া যে বড় কঠিন !'

কথাটা ব'লেই 'জয় শ্রীগুরু' 'জয় শ্রীগুরু' বলে, কার উদ্দেশে হাত জোড় করলেন তিনি।

একটু থেমে নিজেই আবার সুরু করলেন ঘরের কথা: 'ঘর ছাড়ার আগে একদিন স্ত্রীকে ডেকে বললাম,—তোমাকে এই ছেলে দিয়ে গেলাম। একে মানুষ করো। আর যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি আবার বিয়েও করতে পার।

'কথাটি শুনে স্ত্রী আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাছে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বললো, তোমার কাছে কিছু চাই না, মাঝে মাঝে এসে একটু দেখা দিয়ে যেও।'

'যান আপনি বাড়ীতে?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে যাই। খবর দিয়ে যাই না। ...শ্রীগুরু আমায় আরও কৃপা করেছেন। বছর তিনেক হলো সে চলে গেছে। আনন্দ! আনন্দ!'—

সাধুকে ছেড়ে মনটা মুহূর্তের জন্য চলে গেলো হায়দ্রাবাদের সেই সুদূর পল্লীতে। ভারতের চিরন্তনী কিষাণের মেয়ে আপনার দুঃখ আপনিই বহন করে, ভাগ নেবার জন্য ডাকে না কাউকে। প্রতিবাদ করে না, বিক্ষোভও জানায় না। নীরবে আপনার ভাগ্যকে মেনে নেয় ভগবানের বিধান বলে।

সাধুর কথার টানে টানে প্রায় দশ মাইল চলে এসেছি। বেলা তখন প্রায় একটা। বৃষ্টিও পড়ছিলো। একটি সাধারণ চটিতে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। তিন জনেরই রান্না হলো একসঙ্গে। সাধুর খাওয়া দাওয়ায় কোন বাছ-বিচার নেই। অল্প দিলে তা নিয়েই তুষ্ট। বেশি দিলেও আপত্তি নেই। খাওয়া দাওয়া নিয়ে চাওয়া পাওয়ার কোন বালাই নেই তাঁর। যা একবার পেলেন তাতেই আনন্দ।

বেলা তিনটায় আবার যাত্রা শুরু হলো। কেদারনাথের অভিজ্ঞতা মনে রয়েছে। তাই হাতে সময় রেখেই এগিয়ে চললাম। মাত্র চার মাইল উঠতে হবে। এই চার মাইল চড়াই ভেঙ্গে উপরে উঠতেই আবার কত সময় লাগবে কে জানে!

একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিলো। পথও পিচ্ছিল। ক্রমশঃ তুঙ্গনাথের দিকে উঠছি। জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। পাহাড়ের গায়ে কেদারনাথের মতই শ্যাম আস্তরণ। ফুলও ফুটেছে অনেক। ছোট ছোট গাছে নানা পল্লবেব গুচ্ছ। কিন্তু কেদারনাথের মত তেমন বিচিত্র বা বিপুল নয়।

তিন মাইল দূবে থাকতেই দেখা গেলো তুঙ্গনাথের পাহাড়। মন্দির চোখে পড়লো না। পাহাড়টি খুব খাড়া বলে একেবাবে উপরে গিয়ে না ওঠা পর্যন্ত মন্দিরটি দেখা যায় না।

মন্দিরের শেষ তিন মাইল পাহাড়ে ওঠা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। কিছুদূর উঠি আব বসি। সাধুজীর সঙ্গে কথা কওযার মত শক্তিও নেই আর।

তুঙ্গনাথে উঠতে এত কষ্ট হলো যে কেদারনাথের পথেও তা হয়নি।

তুঙ্গনাথের মন্দিব—কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ—এই তুই মন্দিরের চেয়েও উচুঁতে অবস্থিত। তুঙ্গনাথের উচ্চতা প্রায় তের হাজার ফিট। পর্বত-শিখরটি হঠাৎ খাড়া হয়ে গেছে বলে উঠতে খুবই কষ্ট।

তুঙ্গনাথ। নাতিদীর্ঘ একটি মন্দির। কালের কঠিন চিহ্ন আঁকা রয়েছে তার প্রতি অঙ্গে। বড় বড় পাথর খণ্ডগুলি স্থানে

স্থানে কালো হয়ে উঠেছে। ফেটেও গেছে বহুস্থানে। শ্যাওলা পড়েছে সমস্ত মন্দিরের গায়ে। কঠিন পাথরের পাষাণ দেহও ক্ষয়-ক্ষতিতে ক্ষুণ্ণ হয়ে রয়েছে। যুগযুগান্তের জলবায়ুর প্রকোপ থেকে পাষাণও রেহাই পায়নি।

সুন্দর মন্দিরটি। তেমনি প্রাচীন ভারতীয় শৈলীতে গঠিত। শীর্ষে তেমনি একটি সুপরিস্ফুট শিলা-কমল। তার মাঝে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে সুক্ষ্মাগ্র একটি ধাতু-দণ্ড। মন্দিরের সামনে কিছুটা পাথর বাঁধানো জায়গা আছে। আরও কয়েকটি ছোট মন্দিরও আছে বড় মন্দিরের পাশে।

মন্দিরের পাশে পাণ্ডাদের একটি বড় ঘর। একটু দূরে একটি মাত্র ধর্মশালা এবং কয়েকটি দোকান ঘর। মন্দিরকে কেন্দ্র করে জনকয়েক লোক এখানে বাস করে। তা ছাড়া এই বিজন গিরি শিখরে আর কোন জনবসতি নেই। চারপাশে বসবাস করবার মত কোথাও জমিও নেই এতটুকু। সমস্ত দিকে শুধু স্বল্প পরিসরের নগ্ন পাথর।

তুঙ্গনাথ! নামটি খুবই স্বাভাবিক। উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে যে মন্দিরের অবস্থান তিমি কি তুঙ্গরাজির নাথ না হয়ে পারেন! শিখরের একেবারে শীর্ষে স্থাপিত এমন আর একটি মন্দিরও নেই সমগ্র উত্তরাপথে। অন্য সব কয়টি মন্দিরই হয় পর্বতের গায়ে, নয়তো পর্বতের ফাঁকে বিস্তৃত কোন সুউচ্চ সমতল ভূমিতে অবস্থিত। কিন্তু শিখরাশ্রিত তুঙ্গনাথ এখানে আপনার স্বাতন্ত্র্যে আপনি উত্তুঙ্গ।

তুঙ্গনাথের শিখর সুউচ্চ হলেও তীরের মত সূক্ষ্মাগ্র হয়ে ওঠেনি আকাশে। আকৃতিতে তুঙ্গনাথ অনেকটা অশ্বখুরের মত। কিছুটা স্থানও আছে শিখরে। কিন্তু তুঙ্গনাথের সংলগ্ন আর একটি পর্বতশিখরও নেই। সব পর্বতই দূরে দূরে। চারিদিকের অগণিত গিরিমালার মধ্যে তুঙ্গনাথ তাই এক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে

ধ্যানাসীন যোগীর মত একাকী যেন নিশ্চল হয়ে রয়েছে। এই একাকীত্ব তুঙ্গনাথকে সমস্ত তীর্থের মধ্যে এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

তুঙ্গনাথে উঠেই কিন্তু চড়াই ভাঙ্গার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো।

সন্ধ্যার গোধূলীতে আকাশ ছাওয়া। তার মধ্যে জেগে রয়েছে তুঙ্গনাথ। যেন প্রকৃতির কি এক পরম প্রকাশ। চারিদিকে উন্মুক্ত দিগাঙ্গন। তারই সুদূর প্রান্তে ফুটে রয়েছে দিগন্তহীন পর্বত-তরঙ্গ। বিস্ময়মান এই তরঙ্গ সমুদ্রের আলোড়নে তুঙ্গনাথের মন্দিরটি যেন ভেসে রয়েছে একটি উর্ধ্বোন্মুখ তরঙ্গের শীর্ষে। পর্বতের পর পর্বতমালা অনন্ত ঢেউয়ের মত বিলীন হয়ে গেছে আকাশের চারিদিকে। সামনের পর্বতশ্রেণীতে কচি দুর্বার সবুজ সমারোহ। পরের শিলাতরঙ্গে পর্বতমালা ঘন শ্যামাভ। তারপরে গিরিমালা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে নীল, সুনীল আর ঘন নীল বর্ণে। আরো দূরে এই ঘন নীল গিয়ে মিশেছে গাঢ় কালোর সঙ্গে। যেখানে এই কালো তরঙ্গের শেষ হয়েছে তার প্রান্তে জেগে রয়েছে হিমালয়ের অপূর্ব তুষার-শ্রী। শান্ত, শুভ্র ও সুনিবিড়।

সন্ধ্যা-সূর্যের কোমল ছটায় সমস্ত দিগাঙ্গন যেন স্বপ্নায়িত হয়ে উঠেছে। হিম-তরঙ্গের প্রান্তঘেরা শ্বেতাভা আরক্তিম। কালো তরঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে কনকাঞ্চনের মৃদু স্পর্শ। আর সামনের শ্যামাস্তরণে ঝিলিমিলি করছে স্তিমিত সূর্যের স্বর্ণ বর্ণ।

শুধু যে পর্বত-তরঙ্গেই দিগাঙ্গন নিঃসীম হয়ে রয়েছে তাই নয়। তরঙ্গের গায়ে গায়ে ভেসে রয়েছে বহুবর্ণের মেঘমালা। স্থির শিলা-তরঙ্গের মাঝে অস্থির মেঘমালা ভেসে ভেসে চলছে এ-তরঙ্গ থেকে ও-তরঙ্গে। যেন এই অপরূপ তরঙ্গ সমুদ্রের

গায়ে গায়ে ভেসে চলছে আকাশচারী কোন্ এক বলাকার দল।

পর্বতশিখরগুলি এমন থরে থরে সাজান রয়েছে তুঙ্গনাথের চারিদিকে! অকস্মাৎ মনে হবে যেন সমস্ত প্রকৃতিটাই ফুটে রয়েছে একটি অতিকায় কমলের মত। আর তুঙ্গনাথ যেন সেই কমলের মর্মকোরক,—বিলম্বিত পর্বতমালা যেন তার দিগন্তপূর্ণ সহস্রদল। কবে কোন্ যুগারম্ভ থেকে যে এই পর্বত-কমলটি তাকিয়ে আছে আকাশের অনন্ত নীলিমার দিকে! আপনার সৌন্দর্যে আপনি বিভোর। যেন কোন্ অনন্তের ধ্যানে আপনি নিমগ্ন।

কত যুগ অস্ত হয়ে গেছে। কত দিন গেছে নিভে। কত ক্ষণ প্রতিক্ষণ ভেসে গেছে মহাকালের অনন্ত লয়ে। তবু পর্বত-কমলের শতদলরাজির চোখে সুপ্তি আসেনি। সে আসবে! কবে যে সে আসবে! পরমসুন্দর আপন হাতেই তুলে নেবে পরমোৎসর্গিত এই ধ্যানী কমলটিকে। এই জন্যেই বুঝি আপনার একাকীত্বে তুঙ্গনাথের এই অনন্ত প্রতীক্ষা!

যিনি প্রথম স্থাপন করেছেন এই তুঙ্গনাথের মন্দিরটি তিনি কি শুধু সাধক? তিনি কবিও। সমস্ত অনুভূতিতে সৌন্দর্যের এমন অনুপম স্পর্শ না পেলে এমন গগনবিহারী মন্দির নির্মাণের জন্য এরূপ দুরারূঢ় স্থান বেছে নেওয়া কি সম্ভব? তুঙ্গনাথ শুধু দেব-মন্দির নয়। আনন্দ-সুন্দরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যেন একটি জীবন্ত কবিতা!

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। শিলাসন ছেড়ে নেমে এলাম ধর্মশালার সন্ধানে।

তুঙ্গনাথের হাড়কাঁপানো শীত প্রায় কেদারনাথের মত। কেদারনাথের চেয়ে বেশি নয়। কেদারনাথের পাশেই রয়েছে হিমাচ্ছাদিত গিরিমালা। তাই হিম-পর্বত ছোঁয়া বাতাসে কেদার-

নাথের চারিদিকে খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু তুঙ্গনাথের আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে বরফ নেই। হিমশিখরও অনেক দূরে। তাই তুঙ্গনাথের শীত শুধু উচ্চতার জন্য।

সাধুজী ধনসিংকে দিয়ে এরই মধ্যে একটা ঘব ঠিক করে নিয়েছেন। কিন্তু ঘরটা ভারী বিশ্রী। যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি অন্ধকাব। শুনলাম এর চেয়ে ভাল ঘর এখানে আর নেই। খুব উঁচু আব শীত বলে যাত্রী এখানে কম আসে। তাই কেদার-বদ্রীব মত ভাল বিশ্রাম-ঘর করাব দিকে পাণ্ডাদেবও দৃষ্টি নেই।

ঘরে ঢুকবারসময় পাণ্ডা এসে খুব আদর আপ্যায়ন কবে গেলো। বললো কম্বল এনে দেবে, খাবাবেরও বন্দোবস্ত করবে। আরও জানালো যে সে কলকাতায় গিয়েছিল। কোলকাতায় কি কি দেখেছে দু'চারটা ভাঙ্গা বাংলায় তা-ও জানিয়ে দিলো। কিছু কথার পরেই অবিশ্যি আসল কথাটি ব্যক্ত কবে জানালো, মন্দিবেব কোন্ কোন্ স্থানে তর্পণ করতে হবে, আর কোন্ কুণ্ডে স্নান করতে হবে এবং ব্রাহ্মণদের কি কি দক্ষিণা দিতে হবে।

হেসে বললাম: আমিতো পূজো দিতে আসিনি। দেখতে এসেছি। ···আপ্‌কা কম্বল-কি কিরায়া দে দেগা।

বেচারার অমন উৎসাহ মুহূর্তের মধ্যে যেন বাষ্প হয়ে গেলো। ঝাঁঝালো কণ্ঠে দু'চারটি ধার্মিক আক্ষেপ কবেই সবে পড়লো ঘব থেকে।

পাণ্ডার সঙ্গে সাট করে দোকানদারও শাসিয়ে গেলো যে সে পুরী-টুরি বানিয়ে দিতে পাববে না, যদি কম পক্ষে আধ সের হালুয়া তার কাছ থেকে না নেওয়া হয়।

হালুয়ার সের কত হবে সে তো জানা কথাই। বুঝলাম পাণ্ডাদের এটা নন্-কোপারেশনের চাপ। কিন্তু তখন আর যাব কোথায়? বাইরে ঘন কৃষ্ণ রাত। বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। চড়াই

ভেঙ্গে যা ক্ষুধা পেয়েছে ! তার চেয়েও ভয় হলো কাঠ না পেলে রাতে আগুন জ্বালবো কি করে ? আগুন না হলে শীতে যে জমে মরতে হবে !

চাণক্য স্মরণায়ঃ হলাম। ……শঠে শাঠ্যং। …ধনসিংকে দিয়ে ডেকে পাঠালাম দোকানদারকে।

পকেট থেকে নোট বইটা খুলে গম্ভীর ভাবে লিখে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ গ্রাহ্যই করলাম না দোকানদারের উপস্থিতি। মাঝে মাঝে ইংরাজীতে গুটিকয় স্বগতোক্তিও বের হলো মুখ দিয়ে। তারপরে হঠাৎ দোকানদারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে অফিশিয়াল কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম : নাম ? কতদিন থেকে দোকান করা হচ্ছে ? যে-পাণ্ডা এসেছিল তার নাম ?

নাটকের নাটকীয় ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলে গেলো। অফিশিয়াল টোনে নাম জিজ্ঞেস করায় একেবারে চুপসে গেলো দোকানদাব। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে যাওয়ার সময় ধনসিংকে ডেকে নিয়ে কাঠ দিয়ে দিলো। আধঘণ্টা পরেই পুরী নিয়ে আসতে বললো।

কাজটা হলো রিপোর্টের ভয়ে। উত্তবাপথের মন্দির এখন সরকার নিয়োজিত কমিটির তত্ত্বাবধানে। দোকানদার ভাবলো মন্দির কমিটির সঙ্গে বোধ হয় আমাব যোগাযোগ আছে। তাই রিপোর্ট হলে দোকানদারী যদি চলে যায় সেই ভযে সে মুহূর্তের মধ্যে একেবারে সদাশয় হয়ে গেলো।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার মন্দির দর্শনে গেলাম।

পুরানো মন্দির। কথিত আছে যে এটিও শঙ্করাচার্যের সময় রচিত হয়েছে। বড় বড় শিলাখণ্ড দিয়ে মন্দিরটি গড়া।

শিলাখণ্ডগুলি জোড়া লাগাবার জন্য কোন সিমেণ্টের কাজ নেই। একটির উপর একটি করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বড় বড় চৌকোনা এক-একটি পাথরের খণ্ড। পারস্পারিক চাপে এবং ভারে মন্দিরটির ভারসাম্য চুঁইয়ে উঠেছে। মন্দিরটি খুবই জীর্ণ। ছাদের ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণটি স্যাঁৎসেতে হয়ে গেছে। কোন কোন পাথর সরে গিয়ে প্রায় আলগা হয়ে যেন ঝুলছে। সংস্কার না হলে শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা আছে। ভূমিকম্প হলে তো কথাই নেই।

মন্দিরের তোরণে যথারীতি ঘণ্টা ও বৃষভ মূর্তি। সামনে কিছুটা খোলা অঙ্গন। তারপরেই দেব-বিগ্রহ। এ বিগ্রহও শিবলিঙ্গের। এ-পাশে ও-পাশে আরো মূর্তি আছে। সুন্দরভাবে রচিত। মন্দিরের বহির্গাত্রে গাঁথা রয়েছে পাণ্ডবদের মূর্তি। আর বাইরের ছোট মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গের সঙ্গে রয়েছে ভৈরব মূর্তি। ভৈরব শিব-মূর্তিরই কল্পনান্তর। কিন্তু অতি সুন্দর ব্যঞ্জনা। ধ্যানভঙ্গীতে দণ্ডায়মান শ্রী-ভৈরব।

সন্ধ্যার আরতি খুব সংক্ষেপে সারা হলো। যাত্রী নেই। মাত্র সাধুজী আর আমি। বিগ্রহের শৃঙ্গারও হয়নি তেমনভাবে। বেদমন্ত্র পাঠও শুধু রীতি রক্ষার জন্য করা হলো।

কত সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত এমন সুন্দর মন্দিরের সুপ্রাচীন বিগ্রহ! কিন্তু সাধক নেই। অর্থের আকর্ষণ নেই বলে দেবার্চনায়ও নেই তেমন আগ্রহ।

সমস্ত মন্দিরটি ঘিরে রয়েছে অযত্নের চিহ্ন। ভৈরব মূর্তিগুলি পড়ে রয়েছে অনেকটা উপেক্ষিত ভাবে। জলবায়ুব ক্ষয় ছাড়াও শ্যাওলা পড়েছে।

কত সাধকের সাধনাপুষ্ট এই মূর্তিগুলি। ইতিহাসের কত প্রগতির সাক্ষ্য রয়েছে এদের অঙ্গে। পাণ্ডারা এর মর্ম বুঝবে কি করে।

খুব শীত আর চড়াই বলে তুঙ্গনাথে যাত্রী তেমন আসে না। মন্দিরের আয়ও তাই কম। মন্দিরের প্রতি অযত্ন ও উপেক্ষার এটাই কারণ। তাছাড়া তুঙ্গনাথের সঙ্গে বিশেষ কোন পৌরাণিক কাহিনীর সালঙ্কার বিবৃতিও নেই।

শীতের ছ'মাস মদমহেশ্বর নামে একটি নিচু পাহাড়ের এক নির্জন মন্দিরে তুঙ্গনাথের পূজা করা হয়। মন্দির তখন বন্ধ থাকে।

খাওয়া পাওয়া গেল। কিন্তু পাণ্ডা কম্বল দিয়ে গেলো না। কম্বল ভাড়া দেওয়ার কোন বাধাবাধি নেই। পাণ্ডাদের উপরে তাই জোর করাও যায় না। আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের কম্বলেই রাতটা কাটাতে হলো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে।

খুব ভোরে উঠেই রওনা হব ভেবেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ঘর থেকে বের হওয়া গেল না। প্রায় দশটায় বৃষ্টি থামলো। কিন্তু কুয়াশার জন্য একশ' হাত দূরেও কিছুই দেখা যায় না। ঘর থেকে মন্দিরটি পর্যন্ত অস্পষ্ট। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে হবে তুঙ্গনাথের এই শিখর-বিন্দুটি ছাড়া আর সব কিছুই বুঝি পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। কুলাকুলহারা সমুদ্রের বুকে একটা ছোট ভেলার মত যেন ভেসে রয়েছে শুধু এই তুঙ্গনাথের মন্দিরটি।

বেলা বাড়তেই ছাতা মাথায় হালকা বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। অশ্বখুরের মত শিখরের নামার পথ। তুঙ্গনাথের দক্ষিণ কোণটি খাড়া নেমে গেছে অতলান্তে। গহ্বরটার দিকে চাইতে গিয়ে গায়ে যেন কাঁটা দেয়। ওরই পাশ দিয়েঃ এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে অপরিসর একটা কাঁচা-পথ।

বিকেলে গিয়ে পৌঁছলাম গোপেশ্বরে।

গোপেশ্বর এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট পল্লী। থানা, স্কুল, বাজার ও দোকানসমেত বেশ কিছু জনবসতি আছে এখানে।

গোপেশ্বরের মন্দিরটিও খুব প্রাচীন ও সুউচ্চ। দেবপ্রয়াগে রামচন্দ্রের মন্দিরের পরেই বোধ হয় এ মন্দিরের উচ্চতা। গঠনও রামচন্দ্রের মন্দিরেরই মতই। অনেক দিক দিয়ে গোপেশ্বরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পুরাণের উল্লেখ ছাড়াও এর প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে পূজারী ব্রাহ্মণের পরিচয়। শঙ্করাচার্যেব নির্দেশ অনুযায়ী এখনো দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেরা এই মন্দিরের পূজারী। এবং মন্দিরের গায়ে এখনো অনেক প্রাচীন শিলালিপি আছে। তা'ছাড়া কিছু কিছু পুরাণো গ্রন্থও নাকি আছে।

দুর্ভাগ্য আমার মন্দির দর্শন শুরু না হতেই পাণ্ডার সঙ্গে বেধে গেলো ঠোকাঠুকি। আমি এসেছি প্রাচীন মন্দির দেখতে, আব সে প্রথমেই আমাকে নিয়ে গেলো এক নূতন মন্দিবে। মন্দিবে ঢুকেই হুকুমের সুরে বললো : ভেট্ দো! দর্শনি দো!

গাইড হিসাবে পাণ্ডাকে পয়সা দিতে রাজী। কিন্তু যেখানে সেখানেই পয়সা দিতে হবে? যথাপূর্বং অস্বীকৃতির ফলে মন্দিরেব মূর্তি-পরিচয়ে পাণ্ডার সাহায্য আর পাওয়া গেল না। একজন স্থানীয় ব্যক্তিকেই গাইড করে নিতে হলো।

মন্দিরটি উত্তরমুখী। মন্দিবের গায়ে অনেক কারুকার্যময় মূর্তি রয়েছে। সুন্দর সুন্দর গণেশ ও হনুমানের মূর্তি তার মধ্যে অন্যতম। মন্দিরের সামনে একটি খোলা বেদীতে বসানো রয়েছে এগারটি শিব-গৌরীর মূর্তি। এই এগারটি মূর্তিকে বলা হয় একাদশ রুদ্র। মূর্তিগুলি খুব বড় নয়। খুব বেশী হলে উচ্চতায় এক ফুট করে হবে। কিন্তু ছোট একটু পটের মধ্যে এক অনুপম সুষমায় রচিত এই মূর্তিগুলি। কি সুঠাম অঙ্গ-বিন্যাস আর চোখ-

মুখের ব্যঞ্জনা! রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথের পথে যে সব মূর্তি দেখেছি, তার মধ্যে এ মূর্তিগুলির রচনা শৈলী ও সর্বাঙ্গিক অভিব্যক্তি আপন স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্য।

হর-পার্বতীর অনেক শৃঙ্গার-মূর্তি রয়েছে। তারমধ্যে একটি মূর্তির মত প্রকাশ আর কোথাও দেখিনি। স্মিতবদন শঙ্করের একহাত উরুদেশে উপবিষ্টা গৌরীর অধরোষ্ঠ স্পর্শ করে আছে। গৌরীর সর্ব অবয়বে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির পরম চিহ্ন। মুখশ্রী সলজ্জ। আঁখি স্তিমিত। সারা দেহে রমণীয় শিহরণ। সোহাগ-লালিত্য যেন জীবন্ত হয়ে রয়েছে যুগ্ম মূর্তিটিতে।

বৃষ্টি পড়ছে। তবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম একাদশ রুদ্রকে। কিন্তু দুঃখ হলো পাণ্ডাদের অযত্ন দেখে। নিতান্ত উপেক্ষা ভরে মন্দিরের বাইরে ফেলে রেখেছে এই একাদশ রুদ্রের মূর্তি-গুলি। উপরে একটু আবরণও নেই। জল-ঝড়-রৌদ্রে ভারতীয় শিল্প-সাধনার এই অমূল্য নিদর্শনগুলি ক্ষয় হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। অনুসন্ধান করলে এই মূর্তিগুলি ভারত ইতিহাসের অনেক অন্ধকার যুগের সংবাদই শুধু দেবে না,—কি গভীর আগ্রহে শিল্পীর অনুভূতি সুন্দরের সাধনায় তন্ময় হয়ে গেলে এমনি রচনা সম্ভব তারও পরিচয় দেবে।

এখানে দেখবার মত আরো একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। একটি বিরাট কুঠার আর কুঠারের শীর্ষ সংলগ্ন একটি উন্মার্গী ত্রিশূল। সবটাই ধাতু দিয়ে গড়া। লম্বায় প্রায় সাত আট ফিট হবে। কুঠারদণ্ডে কতকগুলি প্রাচীন লিপি আঁকা রয়েছে। লেখাগুলি খুব স্পষ্ট কিন্তু কোন্ লিপি বোঝা যায় না। স্থানীয় লোকেরা বলে কি লেখা আছে এতে আজো নাকি কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। প্রচলিত কথায় এ কুঠারকে বলা হয় পরশুরামের কুঠার।

বাইরেটা দেখে এবার গেলাম মন্দিরে। মন্দিরটি দেখতে কেদারনাথের মত। তোরণদ্বারে আছে ছু'টি বিরাটকায় ভীমমূর্তি। শুনলাম ভিতরে অন্যান্য মূর্তিও আছে। বেশ বড় শিবমূর্তিও। কিন্তু ভিতরটা দেখা হলো না। বিমুখ পাণ্ডার কারসাজীতে মন্দির খুলে দেখান হলো না। কি করবো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম মন্দিরের ছুয়ারে। কল্পনার পটে ফুটে উঠলো শঙ্করের একটি ধ্যান নিমগ্ন বিগ্রহ। স্মিত নয়ন, আত্মস্থ দৃষ্টি। আপনার ধ্যানে আপনি তন্ময়।

এমনিভাবেই হলো আমার গোপেশ্বর দর্শন।

গোপেশ্বরেই রাত কাটাব ভেবেছিলাম। এখানকার ধর্মশালা ভাল। খাবারও পাওয়া যায়। কিন্তু পাণ্ডার ব্যবহারে মুষলধারা বৃষ্টি মাথায় করেই গোধূলীর ছায়ায় এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। মনের ভাব বুঝে সাধুজীও আপত্তি করলেন না। অন্ধকার নেমে আসায় পথ চলতে বেশ কষ্ট হলো। তবু ঘণ্টা দেড় হেঁটে পাহাড়ের অলিগলি দিয়ে আবার এসে পৌঁছলাম অলকনন্দার তীরে।

রাতে যেখানে ছিলাম চামেলী সেখান থেকে একমাইল দূরে। চামেলী ছোট্ট একটু পাহাড়ী নগর। কয়েকটি দোকান আছে। আর আছে একটি হাসপাতাল। চামেলীর গুরুত্ব হলো এই যে হরিদ্বার থেকে এখানে মোটর রাস্তা এসে শেষ হয়েছে। যারা শুধু বদ্রীনাথে যেতে চায় তারা হৃষীকেশ থেকে মোটরে আসে চামেলী পর্যন্ত। এখান থেকে আটচল্লিশ মাইল হেঁটে যেতে হয় বদ্রীনাথে।

কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের যাত্রীরা সাধারণতঃ রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সোজা চলে যায় উত্তরগামী কেদারের পথে। ফেরার পথে উখী-মঠ ও গোপেশ্বর হয়ে আবার এসে মিলিত হয় অলকনন্দার পারে।

কেদার থেকে ফেরার সময় অন্যপথে আসার জন্য অলকনন্দার প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পেছনে ফেলে আসতে হয়। এখানে নন্দ প্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ নামে দু'টি বিশিষ্ট তীর্থস্থান রয়েছে। যাত্রীরা সাধারণতঃ বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে এই তীর্থস্থান দু'টি দেখে যায়।

চামেলী থেকে সাত মাইল দক্ষিণে নন্দ প্রয়াগ। পুবদিক থেকে এখানে নন্দাকিনী এসে মিশেছে অলকনন্দায়। নন্দাকিনীর উৎস হিমালয়ের ত্রিশূলপর্বত। শিব ও নারায়ণের কয়েকটি সুন্দর মন্দির আছে এখানে। এবং মন্দিরে কারুকার্যময় অনেক দেবমূর্তিও আছে। স্থানটি মাত্র তিন হাজার ফিট উঁচু বলে এখানে একটি বড় পল্লীও গড়ে উঠেছে।

সঙ্গমটি মনোরম। নন্দাকিনী নাম হলেও গিরিদবি এখানে নৃত্যরোলে খুব উচ্ছল নয়। অনেকটা যেন শান্ত ভাবেই এসে মিশেছে অলকনন্দার সাথে।

পুরাণের দিক দিয়ে নন্দপ্রয়াগ একটি বিশিষ্ট তীর্থ। বলা হয়, নন্দপ্রয়াগই ছিল কণ্বমুনির তপোভূমি। আশ্রম-কন্যা শকুন্তলার সাথে দুষ্মন্তের মিলন হয় এখানেই। আগে এ জায়গার নাম ছিল তাই কণ্বাশ্রম। রাজা নন্দ এখানে যজ্ঞ করেছিলেন বলে এ স্থানের নাম হয়েছে নন্দপ্রয়াগ। তবে কণ্বাশ্রমের অপভ্রংশরূপে এখনও প্রচলিত কথায় জায়গাটিকে বলা হয় 'কণাসু'।

নন্দাকিনী ও অলকনন্দার মিলনস্থানে দক্ষিণ পার ঘেঁষে একটু বালুময় চর জেগে রয়েছে। এই চরটিতে দাঁড়িয়ে আছে একাকী একটি সমাধি-মন্দির। অলংকার নেই কিছু, কিন্তু আকর্ষণীয়। কয়েক বছর আগে একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এখানে এসে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যু তাঁকে ডাক দিয়েছে—একথা নাকি তিনি আগেই

টের পেয়েছিলেন। তাই দেহ রাখতে এসেছিলেন এই নন্দপ্রয়াগে। ছোট্ট একটি ঘর তৈরী করে সাধন-ভজন করতে করতে অল্প কিছু-দিনের মধ্যে তিনি চলে যান তাঁর পরমারাধ্যের সন্ধানে। মৃত্যুর জন্য তার সুনিশ্চিত অথচ শান্ত প্রতীক্ষার কথা স্মরণ করে স্থানীয় লোকেরা এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নত করে এই সমাধি মন্দিরের সামনে।

নন্দপ্রয়াগ থেকে তের মাইল দক্ষিণে কর্ণপ্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগের উচ্চতা দু' হাজার ফিট। হিমালয়ের পিণ্ডারী হিমস্তব থেকে উৎসারিতা পিণ্ডারীগঙ্গা এখানে এসে মিলিত হয়েছে অলকনন্দার সঙ্গে। উত্তরাখণ্ডে যে কয়টি প্রয়াগ আছে তার মধ্যে কর্ণপ্রয়াগই সবচেয়ে বিস্তৃত। এমনকি ভাগীরথী ও অলকনন্দা যে দেবপ্রয়াগে গিয়ে মিশেছে সে মিলনেও এমন রুদ্র ঝঙ্কার ওঠেনি। পিণ্ডারীগঙ্গা খুব বেগবতী। প্রচণ্ড ধারায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে এসে অলকনন্দার মাঝে। এ-সঙ্গমটি বেশ চওড়া এবং অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে গেছে এব জলবাশি। সঙ্গমের প্রায় মাঝখানে একটা বিরাট শিলাখণ্ড পড়ে রয়েছে। এই পাথরের বুকে রচিত হয়েছে একটি ছোট মন্দির। বিগ্রহের নাম উমাদেবী। কথিত আছে মহাভারতের কর্ণ এখানে উমাদেবীর সহায়তায় সূর্য্যদেবের আরাধনা করেছিলেন। এবং এখানেই তিনি লাভ করেছিলেন অক্ষয় কবচ ও দিব্যবান।

চামেলী থেকে আবার সহযাত্রী হলো অলকনন্দা। পার ঘেঁষে পথ এগিয়ে চলেছে উত্তরদিকে।

বদ্রীনাথ হয়ে তবে সত্‌পন্থে যেতে হয়। বদ্রীনাথের রাস্তা

কেদারনাথের মত নয়। কেদারের ঘন ঘন চড়াই উৎরাইয়ের পথে ওঠানামা করতে করতে যাত্রীরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বদ্রীনাথের পথ উপরের দিকে উঠে গেছে ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে যেখানে নদী বা ঝর্ণা পার হতে হয় সেখানে ওঠানামা করতে হয় বটে কিন্তু তাও ধীরে ধীরে । কেদারের পথে দু'পাশে বড় বড় গাছ। চারিদিকে ঘন বন। পর্বতগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বদ্রীনাথের পথ প্রায় নিরাভরণ। লতাপাতা খুব কম। কিছু কিছু দেবদারু গাছ আছে। অনেক জায়গাতেই পাহাড়ের পাথরগুলি নগ্ন। তৃণ-গুল্মও নেই তাতে। এখানকার পাথরে চুন খুব বেশি। তাই ঝর্ণার জল বা পাহাড়ের রঙ দেখতে অনেকটা শ্বেতাভ।

চামেলির পরে প্রধান চটি পিপুলকুঠি। পিপুলকুঠির কয়েক মাইল পরে গরুড়গঙ্গা। গরুড়গঙ্গা একটি বড় ঝর্ণা নদী। অলকনন্দায় গিয়ে পড়েছে। একটি মন্দিরও আছে সঙ্গমের পাশে। গরুড় গঙ্গার পরেই পাতালগঙ্গা। পাতালগঙ্গার কাছাকাছি রাস্তা খুবই বিপদজনক। বিশেষ করে বর্ষাকালে। রাস্তার পাশে নোটিশ টানিয়ে দেওয়া আছে "সাওধান! পথর গিড়নে কা খত্‌রা হ্যায়।" সাবধানী যাত্রীরা এই আধমাইল রাস্তা এড়াবার জন্য পাঁচ ছ'মাইল চড়াইয়ের আরেকটা ঘোরাপথ বেছে নেয়।

পাতালগঙ্গার পাশের পাহাড়টা বড় শিথিল। শক্ত মাটির গাঁথুনী নেই। আবার কঠিন পাথরও নয় সারা পাহাড়টা। অবিরাম ভেঙ্গে ভেঙ্গে ধসে পড়ছে। রাস্তা বানাবার কোন উপায় নেই। আজকের রাস্তা কাল থাকে না। ওই পাহাড়ী ধসের উপর দিয়েই কোনমতে পা ফেলবার মত রাস্তা করে নিতে হয়। কোন কোন সময় পা রাখতে না রাখতেই পায়ের তলার শিথিল ধস নিচের দিকে গড়িয়ে যায়। আবার কখনো পতনোন্মুখ পাথরখণ্ড বা পর্বতের কোনো একটা ভারী অংশ

আকস্মিক ভেঙ্গে পড়ে উপর থেকে। উপর থেকে পাথর পড়লে সমাধি। আর নিচে গড়িয়ে গেলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে অবশেষে অলকনন্দার স্রোতে ভেসে যাওয়া। এমনি অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে এ-পথে। তাই স্থানীয় পাহাড়ীরাও এ-পথে চলতে খুব সতর্ক।

আমাদের যাওয়ার সময় তেমন বৃষ্টি ছিলো না। পা চালিয়ে এ-পথ দিয়েই এগিয়ে গিয়ে তাই পাতালগঙ্গার কাঁচা পুল পার হয়ে গেলাম।

নদীটিকে যে কেন পাতালগঙ্গা বলে জানা গেল না। ডান দিক থেকে এসেছে নদীটি। দূরে দেখা যায় একটা বিধ্বস্ত সাদা পাহাড়। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নদীটি। বেশ চওড়া কিন্তু জলের বদলে নদী ভরা শুধু চূর্ণ পাথরের বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ড। জলধারা গড়িয়ে চলছে পাথরের নিচে দিয়ে। অনেকটা ফল্গু ধারার মত।

পথে আরও কয়েকটি স্থানে রাস্তা এমনি বিপদজনক। সর্বদা ধসের ভয়। বর্ষাকালে অলকনন্দার দেশে যাওয়া এজন্যই বাঞ্ছনীয় নয়। অবিরাম বৃষ্টির জন্য রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কখন যে পাহাড়ী ধস নামবে বলা যায় না। কিন্তু বর্ষার নদী ও ঝর্ণার উচ্ছ্বাস এবং দুরন্ত বাদলের বিচিত্র রূপান্তরের দৃশ্য দেখে দেখে এক আধটু বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার যে মাশুল তা'ও আপনা থেকেই উঠে যায়।

পরদিন দুপুরে এসে যোশীমঠে পৌঁছলাম।

যোশীমঠকে উত্তরাপথের সবচেয়ে ভাল জায়গা বললে অত্যুক্তি হয় না। ন' হাজার ফিটের উপরে এর উচ্চতা। জল-বায়ু ভাল। চারিদিকের দৃশ্যও সুন্দর। ছোট্ট একটা শহরের মত। দোকান-পাট, ডাকঘর, তারঘর, থানা সবই আছে। অনেক রকম

ফল ও সাক্‌সবজী পাওয়া যায় যা মন্দাকিনী বা অলকনন্দার পারে আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাগান ভরে বড় বড় গোলাপ ফুটে রয়েছে। গাছে গাছে ঝুলে রয়েছে অজস্র আপেল। ধান, ভুট্টা, আলু ও অন্যান্য শস্যের ছোট্ট ছোট্ট ক্ষেতে যোশীমঠের চারিদিক ঘিরেই যেন একটি লক্ষ্মীশ্রী।

তীর্থস্থানের দিক দিয়েও যোশীমঠ বিশিষ্ট স্থান। বরফ পড়ার ছ'মাস বদরীনারায়ণের পূজা হয় যোশীমঠে। এখানে আছে নৃসিংহ, নবদুর্গা ও বাসুদেবের তিনটি মন্দির। মন্দিরগুলি প্রাচীন শৈলীতে রচিত। সব মন্দিরের বাইরেই আছে নানা দেবমূর্তি।

এখানকার গণেশদেবের মত মূর্তি আর কোথাও দেখিনি। অষ্টভুজ এবং নৃত্যছন্দে বঙ্কিম। সুবৃহৎ শুরসহ ভুড়ি-সুডোল দেহটিকে নৃত্যভঙ্গীতে দোলায়িত করে রচনা। শিল্পীর কল্পনা বটে! কিন্তু এরূপ কল্পনায়ও গণেশের নৃত্যপট যে এমন সুন্দর ও কান্তিময় দেখাতে পারে এ মূর্তি না দেখলে সেকথা ভাবা যায়-না।

নৃসিংহদেবের একটি হাত ভাঙ্গা। কোন মতে একটুমাত্র জোড়া লেগে আছে। কিন্তু এমনি অবস্থায় আছে বহু শতাব্দী ধরে। কুমার সংহিতায় নাকি লেখা আছে যে বর্তমান বদ্রীনাথ একদিন অগম্য হয়ে যাবে। তখন যোশীমঠ থেকে সাত মাইল দূরে ধৌলীগঙ্গার পারে বদ্রীনারায়ণের পূজা হবে। শাস্ত্রে এই স্থানটিকে তাই বলা হয়েছে 'ভবিষ্যবদ্রী'।

নৃসিংহ মন্দিরের পূজারীরা যাত্রীদের শুনায় যেদিন নৃসিংহ-দেবের হাত ভেঙ্গে পড়ে যাবে সেদিন বদরী অঞ্চলে ঘটবে প্রচণ্ড ভূকম্পন। পাহাড় ধ্বংস হয়ে বদ্রীযাত্রার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ত ন 'ভবিষ্যবদ্রী'ই হবে বদ্রীতীর্থ।

যোশীমঠের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শঙ্করা-

চার্য্য বদ্রীনাথে পাঁচ বছর সাধনা করেছিলেন। যোশীমঠও তাঁর সাধনার স্থান। এখানে অতি প্রাচীন ও বিশাল একটি বটগাছ আছে। বলা হয় শঙ্করাচার্য্য এরই নিচে বসে ধ্যান করেছেন। শঙ্করাচার্য্যের একটি মঠও আছে এখানে। নাম জ্যোর্তিমঠ। শঙ্করাচার্য্য ধর্ম সংহতির জন্য ভারতের চার প্রান্তে চারটি মন্দির স্থাপন করেন। পূর্বে পুরী, দক্ষিণে রামেশ্বর, পশ্চিমে দ্বারকা এবং উত্তরে জ্যোর্তিমঠ।

যোশীমঠ এলাকার জ্যোর্তিমঠ উত্তরাপথের আর সব মন্দিরের মত.নয়। এখানে পাণ্ডা নেই। সবাই শিক্ষিত সন্ন্যাসী। মন্দিরটি একটি আধুনিক গৃহে অবস্থিত। সুন্দরভাবে আঁকা শঙ্করাচার্য্যের ছবি আছে। কোন ভেট বা দক্ষিণা দেবার রীতি নেই এখানে। মন্দির প্রাঙ্গনটি সুপরিচ্ছন্ন এবং পুষ্পোদ্যানময়। সঙ্গেই আছে একটি আবাসিক সংস্কৃত বিদ্যালায়। মন্দিরের শান্ত ও সুপরিচ্ছন্ন পরিবেশ আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনকে আপনা থেকেই আকর্ষিত করে নেয়।

যোশীমঠে একজন নগ্ন সন্ন্যাসী থাকেন। খুব বৃদ্ধ। জ্যোর্তিমঠের পাশেই একটি মন্দিরে তাঁর কুঠি। দেখতে গেলাম তাঁকে।

একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে আছেন তিনি। অবিরাম একটি ধুনী জ্বলছে তার সামনে। বহুবছর থেকেই নাকি জ্বলছে এমনি। একটা বিড়াল শুয়ে আছে পাশে। সাধুজীর পোষা। মাথার জটা পা পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে। কোমরে একটি মোটা দড়ি বাঁধা। তারই আশ্রয়ে আটকে রয়েছে এক টুকরা কোপীন। গায়ে বস্ত্র নেই কোন। শীতেও এমনি নগ্ন। দেখতে কৃশাঙ্গ। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়লেও কুঞ্চিত নয়,—স্নিগ্ধ সুকান্তিতে মসৃণ। দাঁত নেই একটিও। সারা গায়ে ধুনীমাখা। কেউ বলে একশ পচিশ বছর, কেউ বলে একশ দশ।

খুব সাদরেই তিনি ডেকে নিলেন ভিতরে। •কয়েক মিনিট আলাপের পরে কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করে ফেললাম :.'মহারাজ বয়স কত হলো আপনার ?

'আরে ! ম্যায় তো অব ভী বালক হুঁ !' : বলেই খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলেন। হাসিখুসিতে যে বালকের মত তা'তে সন্দেহ রইলো না একটুও।

সাধুদের অলৌকিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে দু'একটি কথাও জিজ্ঞেস করলাম। সাধুজী হেসে উত্তর দিলেন : 'ওহ্ ম্যায় নঁহী কহ্ সাক্তা। উত্নী 'পাউত্তর' মুঝে নঁহী। মেরা কাম ধ্যান আওর ভজন। ব্যস্ !'

সাধুজীর মধ্যে কোন কপটতা নেই। সবটাতেই খোলামেলা। বালকের মত সরল ও আনন্দময়। কাউকে প্রভাবান্বিত করার কোনো চেষ্টা নেই। জীবন সম্বন্ধে তাঁর নির্ভাবনা আর জড়াতীত শক্তিতে নিঃসংশয় বিশ্বাস।

বেশ ভাল লাগলো দেখে। নিজ হাতে তৈরী ক'রে আমাদের চা খাইয়ে দিলেন এবং ওঠার সময় হাতে দিয়ে দিলেন আপেল ও পাহাড়ী ফল।

যোশীমঠ থেকে দু'টা পথ গেছে সামনের দিকে। একটি গেছে তিব্বত সীমান্তের নিতি গিরিবর্তে। এখান থেকে আট-চল্লিশ মাইল দূরে। এ-পথেও মানসসরোবরে যাওয়া যায়। তবে এ-পথ আলমোড়ার পথের চেয়ে দুরূহ ও দীর্ঘতর ।

বদ্রীনাথে যাওয়ার পথ যোশীমঠ থেকে অকস্মাৎ একেবারে খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। দুই মাইল রাস্তায় প্রচণ্ড চড়াই-উৎরাই। বদ্রীনাথের পথে আর কোথাও এমন আকস্মিক আর এত উঁচু-নিচুতে ওঠা-নামা নেই।

যোশীমঠ থেকে নিচে নেমেই বিষ্ণুপ্রয়াগ। অর্থাৎ বিষ্ণু গঙ্গার

সঙ্গম তার উপরে একটি পুল। ওপারে বিষ্ণুমন্দির। যাত্রাপথ নদীর মাত্র কয়েক হাত উঁচুতে। পুলের উপর থেকে বিষ্ণুগঙ্গাকে কিছুটা দেখা যায়। তারপরেই নদীটি পর্বতের অন্তরালে গেছে বেঁকে। বিষ্ণুগঙ্গার মূর্তি এখানে প্রবল জলস্রোতে উন্মত্ত। বিরাটকায় শিলাখণ্ডগুলিকে ভেঙ্গে চুরে খানখান করে দিয়ে বিষ্ণুগঙ্গা উৎক্ষীপ্ত গর্জনে যেন ফেটে পড়ছে এসে অলকনন্দায়। অলকনন্দাও এখানে কম বেগবতী নয়। দুই উচ্ছলার মিলনে বিষ্ণুপ্রয়াগের ক্ষ্যাপা জলধারা যেন হাতে হাতে তালি দিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

মহাভারতের অনেক তপস্বীর এটা অতি প্রাচীন তপোস্থল। তিনটি পর্বতমালা এসে মিশেছে এখানে। পূবদিকে যোশীমঠের পর্বত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নাম-না-জানা গিরিরাজি। দক্ষিণ-পশ্চিমে হাতীপর্বত। তিনটি পর্বতই জলস্রোতের ত্রিধাবায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

হাতীর মত দেখতে বলে দক্ষিণে অবস্থিত পর্বতটির নাম হাতী-পর্বত। দেখে মনে হয় সত্যি যেন একটি হাতী হাটু ভেঙ্গে নত হয়ে কাউকে প্রণাম করছে। শুঁড় এসে অবনমিত হয়েছে সঙ্গমে, বিষ্ণুগঙ্গাকে মুখোমুখি করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় হাতীর অঙ্গরেখাগুলি যেন স্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে বৃক্ষহীন নগ্ন পর্বতের গাত্রাবরণে। তীর্থযাত্রীদের কল্পনায় এ পর্বতটি তাই বিষ্ণুচরণে সদাপ্রণত গজরূপের মর্যাদা লাভ করেছে।

অলকনন্দার পার ঘেঁষে চলতে চলতে বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে পৌঁছলে যাত্রাপথের সমস্ত অনুভূতিটাই যেন বদলে যায়। বিষ্ণুপ্রয়াগে পা দিয়েই মনে হয় যেন আকস্মিক কোন্ অতল গহ্বরে এসে পৌঁছলাম। পিছে-ফেলে-আসা নদীটির নাম পাতালগঙ্গা না দিয়ে

বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে বদ্রীনাথে যাওয়ার পথটিকেই আখ্যা দেওয়া উচিত ছিলো পাতালপথ। এখান থেকে বদ্রীনাথের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে মনে হবে পথ বুঝি যাত্রীকে নিয়ে একেবারে ধরিত্রীর অভ্যন্তরে রওনা হলো।

দু'দিকেই কঠিন পাহাড়। কোথাও একটু তৃণাবরণও নেই। কর্কশ পাথরগুলি প্রাণহীন দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে পথের দু'পাশে। দু'দিকের পর্বতমালার মধ্যে ফাঁক খুব কম। দৃষ্টি তাই সব সময়ে ডাইনে বাঁয়ে ঠোকর খেয়ে ফিরে আসে। কিছুটা বিস্তৃতি শুধু দেখা যায় সামনের দিকে। এরই মাঝ দিয়ে বয়ে চলছে রুদ্রাণী অলকনন্দা। পর্বতমালার সমান্তরাল বিস্তারে বহুদূর পর্যন্ত কোথাও বিচ্ছেদ নেই। সব দিকেই শুধু পাথর আর পাথর। দিনের আলোও এখানে যেন সব সময়েই স্তিমিত। মধ্যাহ্ন আকাশের একটুখানি ফাঁক দিয়ে মাথার উপরে এসে উঠলে কিছুক্ষণের জন্য তবে সূর্যের মুখ চোখে পড়ে। তাই দেখে স্বস্তি পাওয়া যায় যে এখনো পৃথিবীতেই আছি, পাতালে যাইনি।

এখানে পথ প্রায়ই ডিনামাইট ফাটিয়ে তৈরি করতে হয়েছে। চলতে চলতে কোন কোন জায়গায় মনে হয় বুঝি বা এক একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

এই পাতালপথে চলতে চলতে প্রাচীন ভারতের মন্দির-শৈলীর আদি-দর্শন যেন আবিষ্কার করে ফেললাম। দু'পাশের পর্বতগুলি অদ্ভুতভাবে ঋজুকায়। শিখরগুলি তীরের ফলকের মত তীক্ষ্ণ ও নিরাবরণ। এবং ত্রিকোণাকৃতি হলেও স্থুল ও গোলাকার। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই মনে হবে উত্তরাপথের মন্দির-শৈলীর সঙ্গে যেন অদ্ভুত মিল রয়েছে এই গিরিশিখরগুলির। মন্দিরগুলির গঠনশৈলী দেখে পর্বতশিখরগুলি গড়ে উঠেছে, এতো আর সম্ভব

নয়, বরং উত্তরাপথের মন্দির নির্মাণের কল্পনাটিই বোধ হয় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে পর্বতমালার এমনিতর গঠনশৈলী দেখে।

পাতাল পথে চলেছি। নিরালা মনের অনন্ত আকাশে কত টুকরো টুকরো কল্পনা এসে তারার মত ফুটে উঠছে। এই পর্বত-মালাগুলি যেন নগ্ন-কঠোর গিরিশ্রেণী নয়। যেন প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া শত শত দেবমন্দির। বদ্রীনাথ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি। এ তীর্থভূমির স্বাগত তোরণরূপেই যেন রচিত হয়েছে প্রকৃতিব এই অপূর্ব মন্দিরমালা। ধূসর মেঘগুলি গিরি-মন্দিরেব শিখবে শিখরে উড়ে উড়ে ভাসছে। তাই দেখে মনে হয় বুঝি বা গিরি-মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে দেবার্চনার হোমশিখা।

শিলাময় গিরিমালা না হয় কল্পনার তুলিতে মন্দির হয়ে উঠল। কিন্তু অলকনন্দা?

অলকনন্দা নামটি বলতেই মনে হয় যেন কোন্ কাব্যলোকের জলতরঙ্গিনী। ভারতের কাবো-পুবাণে অলকনন্দার কত বর্ণনা। অলকনন্দা যেন ভারত-মহাকাব্যের দুর্লভ নায়িকা। শান্তা, সুস্মিতা, আজানুকুন্তলা। কিন্তু কাছাকাছি এসে মনে হলো অলকনন্দা কাব্যময়ী হলেও সুশান্তা নয়,—রুদ্রাণী। এই হিম-দুহিতার কুন্তল শুধু লাস্যময়ই নয়, তার বিপুল বিন্যাসে এই অলক নন্দন অলকনন্দাই বটে! পর্বত মানে না, পাথব মানে না,—রুদ্র তরঙ্গে দুরন্তময়ী অলকনন্দা! কোথাও শিলাখণ্ডকে ভাসিয়ে চলেছে। কোথাও তীক্ষ্ণ ফলকের মত দু'হাতি সরণীতে কৃশাঙ্গ হয়ে সমগ্র দেহে তুলেছে বঙ্কিম তরঙ্গের বিচিত্র শিহরণ। কোথাও উচ্ছল চাপল্যে শিলাখণ্ডের বুকে বুকে লাফিয়ে পড়ে রুদ্র নৃত্যে হয়েছে ভাবোন্মত্তা। আর এই ক্ষ্যাপামুদ্রার ব্যঞ্জনা যেন বাষ্প হয়ে ছিটকে পড়ছে পাতাল পথের চারিদিকে।

শঙ্কর-সোহাগিনী অলকনন্দা এখানে যেন সত্যিই নটরাজের নটরাণী!

বিকেলে এসে পৌঁছলাম পাণ্ডুকেশ্বর।

বদ্রীনাথ এখান থেকে এগার মাইল দূরে। একটি প্রাচীন মন্দির এই পাণ্ডুকেশ্বর। অলকনন্দার একেবারে পার ঘেঁষে অবস্থিত। মন্দিরের মাত্র কয়েক হাত নিচু দিয়ে বইছে অলকনন্দা। পাশাপাশি দু'টি মন্দির। দেখলেই বোঝা যায় খুব প্রাচীন। এই মন্দির দু'টির গঠন উত্তরাপথের অন্যান্য মন্দিরের চেয়ে কিছুটা পৃথক। প্রায় সবই এক রকম শুধু মন্দির-চূড়াটি লম্বালম্বিভাবে শির তোলা নয়,—সবটাই ঊর্ধ্বমুখী এবং গোলাকার। মন্দিরের একটিতে নারায়ণের মূর্তি, অন্যটিতে বাসুদেবের। বাসুদেব নারায়ণেরই কল্পনান্তর।

অন্যান্য মন্দিরের মত বিগ্রহদ্বয় শিলানির্মিত নয়। অষ্টধাতু দিয়ে গড়া। দু'টি বিগ্রহই প্রায় তিন হাত দীর্ঘ। ধ্যান-নিমগ্ন ভাবে নির্মিত। নারায়ণের চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম। বিগ্রহ দু'টির মুখশ্রী ও অঙ্গব্যঞ্জনা যে কত মধুর না দেখলে তা বোঝান যায় না। পূজারীর কাছে শুনলাম এ মূর্তিদ্বয়ও বহু প্রাচীনকালের।

পুরাণের বর্ণনানুযায়ী পাণ্ডুকেশ্বর অনেক কালের মন্দির। বলা হয়, পাণ্ডবেরা প্রথম এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। রাজা পাণ্ডু নাকি বহুদিন এখানে তপস্যাও করেছেন। মন্দিরটি যে বহু প্রাচীন তা'তে সন্দেহ নেই। কারণ শঙ্করাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী মন্দিরের পূজারী এখানেও দক্ষিণ ভারতীয়।

পূজারীর সঙ্গে আলাপ হলো। এই প্রথম এমন একজন পূজারীর দেখা পেলাম যাঁর কাছে বিগ্রহ-পূজা শুধু রীতি রক্ষা বা জীবিকা অর্জন করা নয়। পূজারীর চোখমুখ ভাবের

আবেশে সদামগ্ন। কত সুন্দর ফুল দিয়ে পরম যত্নে তিনি সাজিয়ে রাখেন তাঁর ধ্যানী নারায়ণকে। ভাববিহ্বল কণ্ঠে পাঠ করেন বেদমন্ত্র। শুনে মনের কোণে একটা সুস্নিগ্ধ ভাব না এসে পারে না।

এই মন্দিরে কয়েকটি তাম্রপত্র ও শিলালিপি আছে। তাম্র-লিপিগুলি বদ্রীনাথে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই সব ঐতিহাসিক লিপিমালার অধিকাংশই এখনো অনুদ্ধারিত।

পাণ্ডুকেশ্বরের পাশ দিয়ে একটি কাঁচা ঝোলা অলকনন্দা পার হয়ে গেছে ডান দিকে। ডান পারের পাহাড় ভেদ করে নেমে এসেছে একটি ছোট ঝরনা-নদী। এ রাস্তা দিয়ে যেতে হয় হেম-কুণ্ডে। হেমকুণ্ড শিখদের তীর্থস্থান। গুরুগোবিন্দ সিংহ নাকি বলে গেছেন যে তিনি পূর্বজন্মে এ স্থানে তপস্যা করেছিলেন। এ স্থানটি খুঁজে বের করা হয়েছে ১৯৩৯ সালে। হেমকুণ্ডে লোকপাল বলে একটি বড় সরোবর আছে। তার উচ্চতা প্রায় চোদ্দ হাজার ফিট। হিমাচ্ছাদিত স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম।

হেমকুণ্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে আছে একটি পুষ্পবন। এখানে নানাবর্ণ ও বিচিত্র আকারের ফুল ফোটে। ১৯৩১ সালে হিমালয় অভিযানকারী একদল ইংরেজ ভ্যুণ্ডার গিরিপথ দিয়ে ফেরার পথে আকস্মিক এই পুষ্পবনটি আবিষ্কার করেন। এখান থেকে অভিযাত্রীদল অনেক ফুল ও বীজ নিয়ে যান বিলেতে। এরপরে এক ইংরেজ মহিলা পুষ্প নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে আসেন এখানে। কিন্তু দৈবাৎ একদিন পাহাড়ে পা পিছলে পড়ে তিনি মারা যান। ইংরেজ মহিলার দেওয়া নাম অনুযায়ী এই পুষ্পবনকে বলা হয় 'ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স' বা পুষ্প-উপত্যকা।

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে হেমকুণ্ডের দূরত্ব ন' মাইল। কিন্তু সারা পথটাই চড়াই ও সঙ্কীর্ণ। বর্ষায় যাওয়া খুবই বিপজ্জনক।

বিকেলের মধ্যেই পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে ছ' মাইল এগিয়ে এলাম। পাণ্ডুকেশ্বর থেকে পাহাড়গুলি আবার যেন একটু সলজ্জ হয়ে উঠলো। রুক্ষ কঠিন পাথরের গায়ে দেখা দিল কিছু কিছু গাছপালা ও লতাপাতার সবুজ আচ্ছাদন।

সন্ধ্যায় গিয়ে উঠলাম হনুমান চটিতে। হনুমান চটির পাশ দিয়ে একটি ঝরনা বয়ে এসেছে অলকনন্দায়। এর নাম ঘৃতগঙ্গা। পূর্বকালে বৈখানস মুনির আশ্রম ছিলো এখানে এবং রাজা মারুতও এখানে হোম করেছিলেন। পুরাণে নাকি এসব কথা লিখিত রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা বলে ঘৃতগঙ্গার পারে এখনো সেই হোমের যব, তিল ও অঙ্গার পাওয়া যায়। কিন্তু যব ও তিল কেউ পেয়েছে বলে শুনিনি। তবে কয়লা পাওয়া যায় এবং এই কয়লা বোধ হয় খনিজ। পাণ্ডারা যাত্রীদের এই খনিজ কয়লাকেই প্রাচীন অঙ্গার বলে দেখিয়ে দেয়।

এখানে রাত কাটলো একটা খোলা ঘরে। সারারাত অলকনন্দার গর্জন শুনে শুনে খুব ভোরে উঠেই রওনা হলাম বদ্রীনাথের দিকে। বদ্রীনাথ এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে।

পাণ্ডুকেশ্বরের কাছ থেকেই বদ্রীযাত্রীদের চোখে পড়ে একটি নূতন জিনিষ। মাঝে মাঝেই এক-একটা হিমস্তরের ভাঙ্গা চাপ যেন অলস-বিলাসে এলিয়ে পড়েছে এসে অলকনন্দার কূলে। শীতকালে এ স্থানের সবটাই বরফে ঢাকা থাকে। সেই বরফেরই আংশিক অবশেষ এখনো স্থানে স্থানে পড়ে আছে। কেদারনাথ কি তুঙ্গনাথের পথে কোথাও এত কাছাকাছি বরফের চাপ পাওয়া যায় না।

হনুমান চটি থেকে কিছুদূর এগিয়েই বদ্রীনাথের পথ খাড়া হয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে। কিন্তু এই উৎরাই কেদার বা তুঙ্গনাথের মত তেমন কষ্টকর নয়।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম বদ্রীনাথের দিকে। দিনকয়েক পরে কিছু রোদ উঠেছে। মাইল চারেক হাঁটার পরে পাতালপথ কিছুটা উন্মুক্ত হলো। তারই মাঝ দিয়ে দেখা গেল খানিকটা সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমির বাঁ পাশের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট পুরী। মাথায় উড়ছে একটি গৈরিক পতাকা।

দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ। এই বদ্রীনাথ! কত পুরানো এই তীর্থভূমির ঐতিহ্য! ভারতের সমস্ত তীর্থের মুকুটমণি এই বদ্রীনাথ। কত যুগ-যুগান্ত থেকে চলেছে এ-পথে তীর্থযাত্রীদের অনন্ত স্রোত। যে যুগে পথ ছিল দুর্গম—না ছিলো যন্ত্রযানের সহায়তা, না ছিলো বিস্ফোরকের তাপে পাহাড় ভেঙ্গে পথ করার উপযোগিতা, না ছিলো গিরিদরি উত্তরণে কংক্রীটের সেতুবন্ধন —সে যুগেও বন-পর্বতের দুর্গমতা তীর্থযাত্রীব অভিযাত্রাকে রুখতে পারেনি। ভূকম্পনের প্রচণ্ডতায় কত বার বার যাত্রাপথ ভেঙ্গে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। দুরূহ হয়েছে গিরিদবি উল্লঙ্ঘন। তবু রুদ্ধ হয়নি তাদের যাত্রা। অলকনন্দার স্রোতে কত তীর্থযাত্রী ভেসে গিয়েছে। হিমস্তবের পাষাণ চাপে কতজনার ঘটেছে জীবনান্ত। পাহাড়ী ধসে কত যাত্রীর হয়েছে চিরসমাধি। মৃত্যু সেদিনে ছায়ার মত অনুসরণ করতো তীর্থযাত্রীদের। তবু বদ্রীনাথের দুর্বার আহ্বান তীর্থযাত্রীর বুকে তুলেছে অবিশ্রান্ত আলোড়ন। ঘরছাড়া সন্ন্যাসীরাই নয় শুধু,—কত গৃহস্থরাও দলে দলে এই দুর্গম গিরিদরি পার হয়ে সারা জীবনের অঞ্জলি নিয়ে এসেছে এই তীর্থভূমিতে। এসেছে কন্যা-কুমারিকা থেকে, দ্বারকা থেকে, সীমান্ত থেকে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-বাসীরও কত পদচিহ্ন পড়েছে এই পথে। শুধু যে সুস্থ সবল মানুষেরা এসেছে তাই নয়। কত পঙ্গু, আতুর, কত বিকলাঙ্গ কী

প্রাণান্তকর প্রয়াসেই না স্পর্শ করেছে এসে ভারত বিশ্রুত এই পবিত্র ভূমিটুকু।

বদ্রীনাথ! এ শুধু তীর্থভূমি নয়, শুধু দেবমন্দির নয়! এ যেন কত শতাব্দীর শ্রদ্ধাঘন এক স্মরণ-শিখা। এই শিখার আলোক তরঙ্গে জেগে রয়েছে ভারত-ইতিহাসের কত কাহিনী, কত ঋষি-মণীষীর সারা জীবনের সাধনা! বদ্রীনাথ শুধু তাই পরকাল-ভীরুর তীর্থস্থান নয়। যাঁরা জীবনের অন্তঃসলিলার ছন্দগামী, ইতিহাসের হারানো সূত্রের একাগ্র সন্ধানী তাঁদের জন্যও এক পরম আহ্বান হিমাঞ্চল-তীর্থভূমির এই কালান্তহীন বদ্রীনাথ।

আগে হিমালয়ের এই সমগ্র অঞ্চলটির নাম ছিলো গন্ধমাদন পর্বত। নামের একাকীত্বে এখন বৈচিত্র্য এসেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের যে পর্ব্বতটির কোলে বদ্রীপুরী তার নাম হয়েছে নারায়ণ পর্বত। এই নারায়ণ পর্বতের গায়েই বদ্রীনাথের মন্দির। তারই পাদস্পর্শ করে অলকনন্দা প্রবাহিতা। অলকনন্দার পূব-উত্তর পারে এক মাইলের মত বিস্তীর্ণ একটু সমতল ভূমি। তার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে নরপর্বত। উত্তর-পশ্চিম থেকে নেমে এসে এরই মাঝখান দিয়ে বঙ্কিম গতিতে বয়ে চলছে অলকনন্দা।

বদ্রীনাথের বাঁ পাশে একটি ছোট উপত্যকা। সে উপত্যকার চিরতুষারাচ্ছাদিত নীলকণ্ঠ পর্বত থেকে নেমে এসেছে ঋষিগঙ্গা। বদ্রীপুরীর দ্বারে এসে ঋষিগঙ্গা মিলিত হয়েছে অলকনন্দার সাথে। নীলকণ্ঠ উপত্যকার দক্ষিণ পারে উর্বশী পর্বত। এই পর্বতমালাই নিরবচ্ছিন্নভাবে গিয়ে মিশেছে যোশীমঠের হাতী পর্বতে।

এক মাইল লম্বা ও আধমাইলের মত চওড়া—এমনি একটু

সমতলভূমির মত স্বল্প পরিসরের মধ্যে রচিত হয়েছে বদ্রীভূমি। বদ্রীনাথের উচ্চতা দশ হাজার ফিটেরও ওপরে।

এখানকার সমস্ত পর্বতই ধূসর। শিখরগুলিও তীক্ষ্ণ। পর্বতের গায়ে তৃণগুল্ম প্রায় কিছুই নেই। চারিদিক ঘিরে শুধু রুক্ষ কঠিন শিলাপিণ্ড। শীতের ছ'মাস সব কিছুই বরফে ঢেকে যায়। গরমের দিনেও পর্বতের গায়ে গায়ে হিমপ্রবাহ থাকে এলিয়ে। সবদিকের পর্বতশিখর ঘিরেই দেখা যায় তাই হিমস্তরের বিগলিত প্রবাহ।

অলকনন্দা ও ঋষিগঙ্গার উপর দিয়ে দু'টি সেতু পার হয়ে এসে পৌঁছলাম বদ্রীপুরীতে। মন্দিরের বিশ্রামাগারে স্থান পাওয়া গেলো। আধুনিকভাবে গড়া ঘরটি। খাট আছে, বিদ্যুৎও আছে। বদ্রীপুরী তৈলচালিত বিদ্যুতবহ্নিতে আলোকিত। এতদিন পরে একটু সুস্থ হয়ে থাকতে পাব ভেবে মনটা যেন খুশিতে ভরে উঠলো।

পাঁচদিন একসাথে চলার পরে সাধুজী এবার বিদায় নিলেন। তিনি যাবেন সাধুদের ধর্মশালায়। যাওয়ার সময় সাধুর চোখও যেন সজল হয়ে উঠলো। মাত্র কয়দিনেরই বা পরিচয়। তাও মনকে এমনিভাবে নাড়া দেবে ভাবতেও পারিনি সেকথা। কিন্তু মানুষ যে মানুষই, সাধু হলেও।

তপ্ত ঝরনার গরমজলে স্নান করে কিছু খেয়েই নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিলাম পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে। এতদিন পরে একটু বিশ্রামেই শরীরটা যেন ঝরঝরে হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যায় আরতি। মন্দিরের পটও খুলবে তখন। তার আগে পুরী আর মন্দিরের বাইরের দিকটা দেখে নিলাম। সব মিলে শ' আড়াই'য়ের মত ঘর আছে বদ্রীপুরীতে। কয়েকটি ধর্মশালা এবং

মন্দিরের বিশ্রামাগার ছাড়া পাণ্ডারাও যাত্রীদের জন্য ঘর তৈরী করে রেখেছে। সরকারী ডাক ও তারঘর এবং হাসপাতালও আছে। সাধুদের জন্য আছে কিছু স্বতন্ত্র কুঠি। আর বাকী সবই দোকানঘর। খাবারের দোকানগুলি বড় অপরিচ্ছন্ন, দেখে গা যেন রি রি করে। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের এই অখাদ্যগুলি গলাধঃকরণ করেই জঠরাগ্নি উপশম করতে হয়।

বদ্রীমন্দিরের বহিরাঙ্গনটি উত্তরাখণ্ডেব মধ্যে সবচেয়ে বড়। উখীমঠের চেয়েও। মন্দিরের প্রবেশতোবণ মোগ্‌লাই ঢঙে রচিত। দেবালয়ের সামনে একটি গম্বুজাকাব প্রকোষ্ঠ। তারমধ্যে একটি বড় ঘণ্টা ঝুলছে এবং ঘণ্টার সামনে দাঁড়ান আছে একটি বৃহৎ বৃষভ মূর্তি। এই ঘণ্টা ও বৃষভ মূর্তি উত্তবা-পথের প্রতিটি মন্দিরের সর্বজনীন প্রতীক চিহ্ন।

মূল মন্দির-ভবনটি প্রাচীন শৈলীতে গঠিত।

মন্দিবের তোবণ ও গম্বুজাকৃতি প্রকোষ্ঠটি যে বেশিদিনেব নয় তা' দেখলেই বুঝা যায়। শুনলাম, এই স-গম্বুজ কক্ষটি উত্তর ভাবতের এক শেঠজী তৈরী কবে দিয়েছেন। শেঠজী তো 'ধবম কামমে রূপেয়া' ঢেলেছেন কিন্তু সমস্ত উত্তরাখণ্ডের মন্দির-শৈলীকে তিনি যে কি ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছেন তা বুঝবাব মত ঐতিহাসিক দৃষ্টি তার ছিল না। উত্তরভারতের সমস্ত মন্দিরে সারাসনী স্থাপত্যের ছাপ। এমন কি হরিদ্বার ও হৃষিকেশের মন্দিরগুলি পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে প্রাচীন ভারতের শৈলীতে রচিত নয়। একমাত্র উত্তরাখণ্ডের সমস্ত মন্দিরেই প্রাচীন ভারতের গঠনপ্রণালী এখনও সুরক্ষিত আছে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি বদ্রীনাথের মন্দিরাঙ্গন বড় দৃষ্টিকটুভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে অর্থশালী শেঠের অবিবেচনার ফলে। গম্বুজাকার মন্দিরের স্থান উত্তরাপথে নয়, দিল্লী বা উত্তরপ্রদেশে।

আসল মন্দিরটি কবে রচিত হয়েছে কেউ বলতে পারে না। আর সব মন্দিরের মত এ মন্দির নির্মাণের ইতিহাসও সন্ধান করা হয় শঙ্করাচার্যের কার্যাবলীতে। কারো কারো মতে গাঢ়োয়াল নৃপতি বিক্রমাদিত্য পনেরো শতাব্দীতে রচনা করেছেন এই মন্দির-গৃহটি। মন্দিরটি দেখে এ কথাই সত্য বলে মনে হয়। কেদারনাথ বা গোপেশ্বরের মন্দিরের মত বদ্রীমন্দিরকে দেখতে তেমন প্রাচীন বলে মনে হয় না।

মন্দির প্রাচীন না হতে পারে। কিন্তু এ তীর্থভূমির ইতিহাস বহুকালের। আগে এখানকার মন্দির ছিলো প্রাকৃতিক। পর্বতের গুহাই ছিলো আসল দেবালয়। বলা হয়, এক সময় কোনো এক ধর্মান্ধ বৌদ্ধ বদ্রীবিশালের মূর্তিটিকে অলকনন্দায় ফেলে দেয় এবং এ-তীর্থকে বৌদ্ধভূমিতে রূপান্তরিত করে। বদ্রীভূমিতে সাধনা করতে এসে শঙ্করাচার্য স্বপ্নে সন্ধান পান নিমজ্জিত নারায়ণ বিগ্রহের। অলকনন্দার নারদকুণ্ড থেকে তিনি বদ্রীবিশালের বিগ্রহটি পুনরুদ্ধার করেন এবং একটি গুহার মধ্যে এনে বদ্রীমন্দিরকে নূতন করে আবার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান পূজারী দক্ষিণ ভারতের নাম্বোদ্রী ব্রাহ্মণ। এখনো শঙ্করাচার্যের নির্দেশ পালিত হচ্ছে বদ্রীনাথ ও উত্তরাখণ্ডের সবকয়টি প্রধান মন্দিরে। শঙ্করাচার্যই যে উত্তরা-পথের প্রধান মন্দিরগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন ইতিহাসের এই ইঙ্গিতটুকু আজো এই পুরোহিত-বরণের প্রথা অনুসরণের ভিতর দিয়ে অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

হিমাঞ্চলের সর্বত্রই শঙ্করের অধিষ্ঠান। তীর্থগুলিতে বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় তাই শিবমূর্তিই দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শঙ্করকে স্থানচ্যুত করে বদ্রীনাথে নারায়ণের প্রতিষ্ঠা হলো কি করে?

কেদারভূমি ও বদ্রীভূমিকে যেন শঙ্কর ও নারায়ণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। বদ্রীনাথ, পাণ্ডুকেশ্বর ও যোশীমঠের প্রধান মূর্তি নারায়ণের। আর অন্যান্য মন্দিরে শিবলিঙ্গই প্রধান বিগ্রহ।

"বদ্রীনাথে নারায়ণ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী বলা হয়। এখানেও নাকি এক সময় হর-পার্বতীর অধিষ্ঠান ছিলো। একদিন হর-পার্বতী অলকনন্দার পারে বেড়াতে গিয়েছেন। এমন সময় পার্বতী দেখলেন যে একটি সুকান্ত কিশোর অলকনন্দার তীরে একলা বসে বসে কাঁদছে। পার্বতী মহাদেবের কাছে অনুনয় করে বললেন : 'ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে চলো।'

কিশোরটি নারায়ণের ছলমূর্তি হতে পারে এমন একটা সন্দেহ জাগলো মহাদেবের মনে। তবুও পার্বতীর আগ্রহে ছেলেটিকে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

পরদিনও হর-পার্বতী যথারীতি অলকনন্দার তীরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার পরে ফিরে গেলেন মন্দিরে। কিন্তু গৃহের-অঙ্গনে ঢুকেই দেখেন মন্দির-দুয়ার বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরে কিশোর কণ্ঠের উত্তর এল : 'আমি নারায়ণ। আমিই এখানে থাকবো। তোমরা কেদারে চলে যাও!'

মহাদেব পার্বতীকে বললেন 'দেখলে তো আমি আগেই বলেছিলাম ও কিশোরটি ছলরূপী নারায়ণ।'

কি আর করেন তাঁরা। নিরুপায় হয়ে কিশোর নারায়ণকে বদ্রী অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে হর-পার্বতী চলে গেলেন কেদারনাথে। সেই থেকেই বদ্রীনাথ হলো নারায়ণের আবাসভূমি।"

এমনি কাহিনী ইতিহাসের চোখে কল্পনা মাত্র। কিন্তু মানবিক মাধুর্যে একান্ত সুস্নিগ্ধ।

বহিরাঙ্গন দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মন্দিরের দুয়ার উন্মুক্ত হলো। আরতির সময় হয়েছে।

দলে দলে আসছে যাত্রীরা। সুস্থ, সবল, আনন্দময় কত নরনারী। জীবনের পথে দীর্ণ-বিদীর্ণ আরো কত যাত্রী। যেন কত অজানা মানুষের কি এক বিচিত্র সমাবেশ। কেউ কারো ভাষা জানে না। আচারে ব্যবহারেও বিভিন্ন। কত ধরণের বেশ। কত অঙ্গভূষণ— ধুতি, পাজামা, লুঙ্গি, ট্রাউজার, টুপী, পাগড়ী। তার সঙ্গে ঘাগরা, শালোয়ার কত বিচিত্র শাড়ী। কোন বাধাবন্ধ নেই। কত অদ্ভুত রুচিতে সজ্জা হয়েছে তীর্থকামী নারীদের। অঙ্গে অঙ্গে তাদের কত অলঙ্কার। বসনের বাহারেও যেন অন্ত নেই। অধিকাংশই কিষাণী। সুন্দরী হয়ে যেন এরা এসেছে পরম সুন্দরের দর্শনে।

সমস্ত ভারতবর্ষ যেন এসে মিলিত হয়েছে এই মন্দির প্রাঙ্গনে। অখণ্ড ভারতবর্ষকে যদি দেখতে চাও,—বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতের সংহত রূপ যদি উপলব্ধি করতে চাও,—তবে আসতে হবে এমনি তীর্থভূমিতে যেখানে এসে মহাভারতের মহাধারা এমনিভাবে সম্মিলিত হয়েছে এক পরম একাত্মবোধে।

যাত্রীরা আসছে। যুক্ত করে এগিয়ে আসছে। চোখে-মুখে তাদের কি পরম তৃপ্তি, কি অপার আনন্দের ঢেউ! শিশুর মত স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে ঘন ঘন তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে বদ্রী-বিশালের। জয় বদ্রীবিশাল! জয় বদ্রীবিশাল! এঁরই দর্শন কামনায় কত দেশ থেকে কত প্রান্তর পার হয়ে এসেছে ওরা। মানেনি বন-পর্বত। মানেনি দুরূহ পথের অসীম ক্লান্তি। নির্নিমেষ নয়নে ওদের আকুল তিয়াসা। বাইরের জগত যেন আজ ওদের কাছে অস্তিত্বহীন। কেউ করছে স্তোত্রপাঠ। কারো মুখে শুধু, 'নারায়ণ! নারায়ণ!' মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে কারো ভাববিহ্বল আঁখি থেকে। কেউ বা স্তিমিত নেত্র। কেউ বা আত্মস্থ। কেউ

নিস্পন্দ। এই অগণিত মানবাত্মা ক্ষণিকের জন্য যেন আজ ডুবে গেলো দেহোন্মুক্ত এক মহাভাবের অনন্ত সমুদ্রে ।

বেদমন্ত্রীরা দু'পাশে দাঁড়িয়ে বেদপাঠ করছেন। ধ্রুপদের গম্ভীর সুরে বেদধ্বনির উদাত্ত স্বরগ্রাম নিবিড় তরঙ্গের মত একবার উঠছে আবার নামছে। ধূপশিখায় মন্দিরাঙ্গন সুরভিত। পূজারীর হাতে বেজে উঠছে ঘণ্টা। বিভিন্ন মুদ্রায় দোলায়িত হচ্ছে দীপমালা। শঙ্খ, পুষ্প, ঘৃত, চন্দন—কতভাবে অর্চনা হচ্ছে বদ্রীবিশালের। পুষ্পে পল্লবে সমস্ত দেবপট পরিপূর্ণ। বদ্রীবিশালের সমস্ত অঙ্গে বনকুসুমের বিচিত্র ভূষণ। ব্রহ্মকমলের মনোরম সমারোহ।

এই বদ্রীবিশালের শৃঙ্গার মূর্তি।

মন্দিরের এককোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি সন্ধ্যার আরতি।

একদিকে নারায়ণ! শিল্পীর একান্ত সাধনায় পাষাণকে প্রাণময় করে তোলার ভাব-মধুর প্রয়াস। আরেকদিকে অগণিত যাত্রীর দল। চোখে-মুখে প্রেমের বন্যা। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অপূর্ব লাবনি। সুন্দরের সাধনা আর প্রেমের দ্যুতি,—দুইয়ে মিলে যেন পরম সুন্দর হয়ে উঠেছে সন্ধ্যারতিব এই অপূর্ব মূহূর্তটি।

দেখছি। আর ভাবছি······

কে ভাঙ্গতে পারে মানবমনের এই কুলাকুলহীন অনন্ত রূপায়ণ?

এই যে পাষাণ বিগ্রহ সেই কি দেবতা? ঐ দেবতাই তো নিমজ্জিত হয়েছিলো অলকনন্দায়! ওরই বিগ্রহ কত বার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে সোমনাথে! তবুও কেন নিঃশেষ হলো না ঐ বিগ্রহ!······

নির্বোধের দল এমনি করে মানুষের অন্তঃসলিলাকে চায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে। যেন ঐ শিলাখণ্ডের বিচূর্ণন—রক্ত-

আভরণের অপহরণ—তাই দিয়ে তারা বন্ধ করে দেবে অশান্ত মানবাত্মার অনন্ত বীক্ষণ।

মূর্খ! কে বলে ঐ শিলাখণ্ড দেবতা! কে বলে ঐ স্বর্ণালঙ্কার দেব-ভূষণ! ফিরে দেখো ঐ যাত্রীদের দিকে! দেখছো কিছু! ঐ যে পূর্ণ সরোবরের মত টলটল করে ভাসছে সহস্র আঁখি! দেখছো কিছু ঐ জল-তরঙ্গের আকুল বিসরণে!

ফিরে তাকাও বিগ্রহের দিকে। কি দেখছো ঐ আভূষিত শিলাখণ্ডে? ঐ হোমাগ্নির ধূপশিখায়? ঘৃত-চন্দনেব আলপনায়? পুষ্পপল্লবের নিরুপম কেলীতে?

এই চোখ দিয়েই তুমি চূর্ণ করবে দেবতাকে? মূর্খ! তোমার মূর্খতা কালের মরুবালিতে কত বাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! তবুও তোমার চৈতন্য হয়নি!

পাষাণের বুকে শিল্পীর ঐ যে আকুল সাধনা! ঐ যে আঁখিতে আঁখিতে প্রেমাশ্রুর আকুল ধাবা! সেই আকুল-মিলনের পরমক্ষণে জেগে ওঠে যে ভাব-তবঙ্গ—অনুভব কবেছ কখনও তার পবম শিহরণ?

তবে!……

দাঁড়িয়ে আছি। আরতি কখন শেষ হয়ে গেছে। যাত্রীরা শুরু করেছে মন্দিব প্রদক্ষিণ। দাঁড়িয়েই আছি তবু। মন্দির ও যাত্রীরা যেন ক্ষণিকের জন্য অবলুপ্ত হয়ে গেলো। যেন কোনো বাণী নেই, বর্ণ নেই! যেন আজ নয়, কাল নয়। যেন আমি নেই, তুমি নেই! সব যেন ডুবে গেলো কোন্ অনন্ত নিঃসীমতার অসীম সমুদ্রে। শুধু জেগে রইল একটি আবেদন তরঙ্গ স্পন্দনেব বুক ভাসিয়ে মাত্র একটি শুধু বেদনা।……

আছে কি এর উৎস? আছে কি এর কোনো আঁদি-অন্ত?··· আনন্দের আকুল তৃপ্তিতে পরম উপলব্ধি!······

বদ্রীনাথের মন্দিরে পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্য নেই। মন্দিরের অভ্যন্তরে যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা আদায়ের কোনো অশোভনীয় আচরণও নেই। মন্দির কমিটির সম্পাদক বদ্রীনাথেই থাকেন। হয়ত তারই এই প্রভাব।

মন্দিরের পাশেই অলকনন্দা। অলকনন্দার পারে অনেক কুণ্ড। একটি উষ্ণ জলধারাও আছে। নাম তপ্তকুণ্ড। ফুটন্ত জলের মত গরম এর ধারা। প্রহ্লাদ-কুণ্ড নামে আরেকটি নাতিশীতোষ্ণ জলধারা আছে। অলকনন্দার বরফ-গলা জলস্রোতের পাশে ইষৎ ও অতি উষ্ণ এই ধারা দুটিতে স্নান করে শীতকাতর যাত্রীরা খুবই আরাম্ পায়।

মন্দির এখানে ছয়মাস উন্মুক্ত থাকে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই যাত্রী যায় বেশি। প্রতি বছর গড়ে প্রায় পঁচাত্তর হাজার যাত্রী বদ্রীনাথ দর্শন করে। যাত্রীদের ভোগ, দক্ষিণা ও তর্পণ থেকে বছরে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকা আয় হয় মন্দিরের। এই অর্থ মন্দির কমিটির হাতে থাকে। বদ্রীপুরীকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার কাজে এই অর্থের এখনো তেমন সদ্ব্যবহার হয়নি।

বদ্রীবিশালের বিগ্রহ দিনের বেলা সুস্পষ্ট দেখা যায় না। রাত্রে আরতির পরে বিগ্রহকে পুষ্পাভরণ-মুক্ত করা হয়। সে-সময় প্রদীপের আলোতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় বিগ্রহের অঙ্গসৌষ্ঠব। বদ্রীবিশাল দৈর্ঘে প্রায় দুই ফুটের মত হবে। মূর্তিটি পাথরেব। চতুর্ভুজ। ধ্যান-উপবিষ্ট এবং স্তিমিত-নয়ন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় বিগ্রহের দেহ ক্ষয় হয়ে গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম গঠনও

অনেকাংশে 'মসৃণ। অলকনন্দায় বহুদিন এই নারায়ণ বিগ্রহ নিমজ্জিত ছিল বলে যে-কাহিনী প্রচলিত আছে বিগ্রহের ক্ষয়িত অঙ্গ দেখে সে-কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। ক্রমাগত জলধারা বয়ে গেলে পাষাণের দেহও যেমন মসৃণ হয়ে যায়, বিগ্রহের দেহেও তার চিহ্ন বর্তমান। ✓

একমাস ধরে ঘুরে বেড়ালাম এই উত্তরাপথে। এই হিমাঞ্চল তীর্থের মন্দির ও বন-পর্বতগুলিই যে সুন্দর তাই নয়। এদেশের লোকেরাও সুন্দর।

এদেশের সম্পদ্ উত্তুঙ্গ গিরিমালা গভীর অরণ্য নদী আর অফুরন্ত ঝরনাধারা। সমতলভূমি কোথাও নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে নদীর বাঁকে কিছুটা নাতিবন্ধুর ভূমি মেলে পাহাড়গুলি অনেক জায়গায় বেশ ঢালু। মিঠে মাটিও আছে তাব গায়ে। এমনি ছোট ছোট জায়গায় যেখানে কিছুটা মাটি আব ঝরনার জল আছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে এক একটি পাহাড়ী পল্লী। পাঁচঘর দশঘর কি পঁচিশঘর। এর চেয়ে বড় পল্লী বিশেষ নেই। সব পল্লীই নদীর পারে, নয়তো ঝরনার ধারে। পাহাড়েব গায়ে গায়ে গাঁওগুলি এমন থরে থরে সাজানো রয়েছে যে দূর থেকে মনে হবে বুঝিবা এক্ষণি গড়িয়ে পড়ে যাবে। পাহাড়ী ধংসের ফলে অনেক সময় এসব পল্লীগুলিও বিলুপ্ত হয়ে যায় এই অঞ্চলে বসতির জায়গা ও অন্নসংস্থানের সুযোগ কম বলে জন-বসতিও খুবই বিরল।

শস্য হয় এখানে ধান আলু আর কিছু সব্জী। যোশীমঠের কাছাকাছি এলাকায় আপেল ও অন্যান্য পাহাড়ী ফলও পাওয়া যায়। উঁচু জায়গাগুলি ফুলে ফুলময়। এমন অজস্র ফুল আছে য এখনো সমতলে যায়নি।

গম ভাঙ্গে এরা এক অভিনব গেঁয়ো যন্ত্রে। কাঠ দিয়ে তৈরি করে পাখাওয়ালা চাকা। ঝরনার জল নালা দিয়ে এনে ছেড়ে দেয় ঐ পাখার উপরে। পাখা আপনা থেকেই আবর্তিত হয়। চক্রদণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত যাঁতাটিও তখন ঘুরতে থাকে। এবং এইভাবেই গম পিষে আটা বেরিয়ে আসে যাঁতার ভিতর থেকে।

এদেশের লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র। স্বল্প জমির ক্ষেতি, তীর্থযাত্রীদের কাছে চা দুধ এবং চাল ডাল আটা বিক্রি করা, কুলিগিরি করা এবং উল বোনা—এই এদের কাজ। জামাকাপড়ে নোংরা হলেও প্রকৃতি যেন এদের দেহে সৌন্দর্যের ফোয়ারা বইয়ে দিয়েছে। কচি কচি ছেলেমেয়েগুলি দেখতে যেন রাঙ্গা আপেলের মত টুকটুকে। যেমনি রঙ তেমনি নাকচোখ। বুনিয়াদী ব্রাহ্মণ যারা তাদের রূপের তো কথাই নেই। সাধারণ কিষাণদের গায়ের রঙ আর অঙ্গ-সৌষ্ঠবও দেখবার মত।

পথে চলতে চলতে এদেশের মেয়েরা যেন পথিকের চোখে শুকতারার আলো ছড়ায়। কি স্ফূর্তি আর কি উচ্ছ্বাস! যেমনি জীবন্ত তেমনি সদা কর্মরতা। ঘরে-বাইরে এদের অবারিত জীবন। ধান ছড়াচ্ছে, জল গড়াচ্ছে, ক্ষেতে আগাছা নিড়িয়ে দিচ্ছে। পিঠে বেঁধে বড় বড় ঘাস বা কাঠের বোঝাও এরাই বয়ে আনছে। ভারী ভারী আসবাব পত্র বয়ে আনতেও এদের দ্বিধা নেই। পিঠে বোঝা তবুও হাতের বিরাম নেই। সবারই হাতে উলকুর্সি, চলছে আর বুনছে। ঘরে এরা উল বোনে, পশমী জামা বানায়। পথে পথে চায়ের দোকানে আলুর বড়া, কি পেঁয়াজী ভাজা চায়ের সাথে যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে। কাজ ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও এ-দেশের মেয়েদের দেখতে পাওয়া দুর্লভ।

মহাভারতের মহাবীরেরা কেন যে উত্তরাপথে এসে ধনুর্বাণ ভুলে পুষ্পশর তুলে নিতেন এদেশের মেয়েদের দিকে একটু তাকিয়ে

দেখলেই তা বোঝা যায়। মেনকাকে দেখে এখানেই মুনির তপোভঙ্গ হয়েছিল। দুষ্মন্তও শকুন্তলার সাক্ষাৎ পান এখানেই। উর্বশীর জন্মও এই বদ্রীভূমিতে। এসব পুরাণের কাহিনী হলেও নারীরা এখানে রূপক নয়। সত্যিই জীবন্ত রূপের প্রতিমূর্তি। ঋজু কৃশাঙ্গী নিটোল কিন্তু সমগ্র দেহময় সুকান্তির স্নিগ্ধতা। আরক্তিম মুখাবয়বে যেন পটের ছবির মত আঁকা তীক্ষ্ণ নাক ও বাঁকানো ভুরু। নীলাভ চোখের স্বচ্ছতায় কালো মনিটি যেন টলমল করে ভাসছে। চোখের পল্লবও আপনি থেকেই নীলাঞ্জন ছাওয়া। আঙ্গুলগুলিও চাঁপা-কলির মত সুডোল ও সূক্ষ্মাগ্র। অলকনন্দা-পারের মেয়ে হয়েও কিন্তু এদের অলকগুচ্ছের স্বাচ্ছন্দ্য নেই। এই কেশকার্পণ্য ছাড়া প্রকৃতি যেন এদের জন্য রঙ তুলি ধরতে বাকী রাখেনি কিছুই।

কিন্তু নিজেদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে এরা যেন তেমন সচেতন নয়। সারা গায়ে পুঞ্জিত নোংরা। জামাকাপড়ও তেমনি। স্নানের বালাইও নেই। কাছ দিয়ে গেলে বাতাসের ঢেউটা দূরে না যাওয়া অবধি নিঃশ্বাসে যেন নাক জ্বলে যায়।

একটা দিকে কিন্তু এদের খুব আকর্ষণ। কি কিশোরী বা তন্বী কি বৃদ্ধা—কারো গায়েরই অঙ্গভূষণের অন্ত নেই। নাকের ডগায় ঝুলছে সোনার নথ। নথের সঙ্গে ইঞ্চি তিনেক ব্যাসের রৌপ্য বলয়। বেশি ঝুলে পড়ে যদি নাক কেটে যায় তাই একটি চেন দিয়ে আবার কানের সঙ্গে আটকানো থাকে বলয়টি। এর উপর নাকে আবার আছে নাকছাবি। কানের লতি তো দুলের ভারে ছিন্নপ্রায়। ফুটোর পর ফুটো করে একজোড়া নয়, অন্তত তিন-চার জোড়া করে দুল ঝুলছে প্রতি কানে। গলায় জড়িয়ে আছে মোটা মোটা হাঁসুলী আর নানা বর্ণের পাহাড়ী পুঁতির মালা। হাত বেড়িয়ে কঙ্কন।

পায়ে বাজু। হাত-পায়ের আঙুলে পর্যন্ত নূপুরনিচয়। সব অলঙ্কারই প্রধানত রূপোর। অলঙ্কারের সংখ্যা কারো কারো আরো বেশি। এত সুন্দর হয়েও গয়নার বোঝা দিয়ে নিজেদের যে কেন এরা এমন অসুন্দর করে তোলে!

এদেশের লোকেরা গরীব হলেও অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির। চুরি-ডাকাতি এখানে নেই বললেই চলে। হাজার হাজার যাত্রীরা এ পথে যাতায়াত করে নির্বিবাদে। কা'রো একটি জিনিসও খোয়া যায় না। কত জায়গা থেকে মেয়েরা বৃদ্ধারা পর্যন্ত কোনো পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে না নিয়ে একলাই আসেন তীর্থযাত্রায়। কিন্তু পথে তাদেব কোন বিপদে পড়তে হয় না।

জিনিসপত্র বেচবার বেলায় কিন্তু যাত্রীদের কাছ থেকে এরা খুব পয়সা আদায় করে নেয়। তীর্থযাত্রীদেব কাছে তিন চার মাস বিকিকিনিই এদের অর্থ উপার্জনের প্রধান উপায়।

উত্তরাপথের পাহাড়ী জনতা এমন সদাচারী হলো কি করে! বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত পাহাড়ী বলে! কিন্তু তাও তো নয়। গাঢ়োয়াল থেকে ঘরে ঘরে নওজোয়ানেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। বরং সেনা-জীবনের অ-নৈতিকতার ঝোঁকে এদের জীবনধারাও প্রভাবান্বিত হওয়ার কথা। যেমন হয়েছে পাঞ্জাবের জনজীবনে। কিন্তু গাঢ়োয়ালীদের সরল ও সৎজীবন ঘিরে রয়েছে প্রবল ধর্মভাবের প্রভাব এবং রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহ্য। জীবনের প্রতি স্তরে এদের পৌরাণিক যুগের সংস্কৃতি-বোধ। যুগ যুগ ধরে এদের জীবনে পৌরাণিক স্মৃতি যেন সহজাত সংস্কারে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সহজেই বোধ হয় তাই এত দরিদ্র হয়েও এরা এমন সদাচারী।

শুধু মানুষেব গড়া মন্দির আর পুরী দেখেই বদ্রীভূমির দেখা হয় না। অতীতে এখানে গৃহ নির্মিত কোন মন্দির ছিল না। সারা বদ্রী-অঞ্চলই ছিল বদ্রীবিশালের অখণ্ড মন্দির। প্রকৃতির উদার প্রকাশে বিস্তৃত ছিল সমগ্র দেবাঙ্গন। আজকেও কি এই মন্দিরটুকুই বদ্রীভূমির সব? কত সুন্দর কত কারুকার্যময় মন্দির তো সমতলভূমিতেও আছে। কি প্রয়োজন ছিল তবে এই দুর্গম বন-পর্বতে মন্দির রচনাব?

প্রকৃতি এখানে আদি শিল্পীর কাছ থেকে দূবে সবে যায়নি। যুগ-যুগান্ত থেকে ভারত-পথিকেরা খুঁজে বেড়িয়েছেন এমনি একটু নিরালাভূমি—যার গায়ে সমাজের ছায়া পড়েনি, কৃত্রিমতার ধূলি ওড়েনি, কৃষ্টি-সংস্কৃতির রঙ ধরেনি। বনে-পর্বতে কি তটিনীর কূলে কূলে, নয়তো মহাসাগরের ধারে ধারে তাই রচনা করেছেন তাঁরা পরমাত্মার সাধনপীঠ, গড়ে তুলেছেন দেব-মন্দির। প্রকৃতির মধ্যেই যেন তাঁরা সন্ধান করেছেন প্রাকৃতকে।

কত ঋষি মনীষী এসেছেন এই বদ্রীভূমিতে। রামায়ণ-মহাভারতের কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে। বৈদিককালে বশিষ্ঠ কশ্যপ অত্রী জমদগ্নি গৌতম বিশ্বামিত্র অগস্ত্য ব্যাস প্রমুখ ঋষিরা এই অঞ্চলে এসেছিলেন তপশ্চর্যার জন্য। পুবাণে এমনি অনেক কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। বুদ্ধদেবও এখানে এসেছিলেন সাধনার উদ্দেশ্যে। শঙ্করাচার্য বহুদিন তপস্যা করেছেন এখানে। স্বামী বিবেকানন্দ দয়ানন্দ এমনি আরো কত মহা-মানবের স্মৃতি রয়েছে এই বদ্রীভূমির মাটিতে। বদ্রী-অঞ্চলের পর্বত, গুহা, অলকনন্দার তটভূমি, তাই শত ঋষি-মনীষীর পুণ্যস্মৃতিতে পূরিপূর্ণ। বদ্রীভূমির আরেক নাম তাই তপোভূমি।

তীর্থদর্শনে কি ফল হবে জানিনা। কিন্তু যে অশান্ত চিত্ত মহাযাত্রীর দল ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন জীবনের উৎস-সন্ধানে—

যাঁদের পায়ে-চলাব পথকে কোনো বনপর্বত রুখতে পাবেনি—সেই দুর্জয় মানবদের তপোভূমি এই বদ্রীভূমি। চাবিদিকে ছড়িয়ে আছে তাঁদেব পুণ্য জীবনেব কত স্মৃতি। এই স্মৃতিব সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে প্রকৃতিব উন্মুক্ত পটে তাব অনুভব না হলে কি কবে পূর্ণ হবে বদ্রী-দর্শন!

অলকনন্দাব তীবে সাথীও মিলে .গলো। উত্তব ভাবতের এক তরুণ শিল্পী। এসেছে বদ্রী-অঞ্চলেব ছবি আকতে। বেশ সাদাসিধে। আত্মভোলা মন। ভাব হযে গেল দু' দিনেই।

খুব ঘুবে বেডালাম দু'জনে। অনুদ্দেশ্য মনে গেলাম গুহায় গুহায পাহাডেব উপবে ঝবনাব ধাবে অলকনন্দাব তীরে তুষাবেব স্তূপে স্তূপে। শুধু মন্দিবেব ঐ নাতিদীর্ঘ পটটুকুই বদ্রীনাথ নয, সমস্ত বদ্রীভূমি জুডে বযেছে বদ্রীনাথেব আহ্বান। বদ্রীনাথেব আবেক নাম তাই বদ্রীবিশাল।

শিল্পীব নাম দিযেছি আমি সাবথী। পবদিন দেখতে গেলাম কেশবপ্রযাগ। সবস্বতী নদী যেখানে অলকনন্দায এসে মিশেছে তাবই নাম কেশবপ্রযাগ। বদ্রীনাথ থেকে মাইল দুয়েক দূরে।

কেশবপ্রযাগে যেতে হয় একটি গাঁযেব উপব দিযে। এ-গাঁয়েব নাম মানাগাঁও। গ্রীষ্মেব ছ' মাস গাঁওবাসীবা বদ্রী-অঞ্চলে থাকে। শীতেব সময গ্রাম ছেড়ে নীচে চলে যায়। পাথবেব গায়ে গায়ে মানাগাঁয়ে অনেক বুদ্ধমূর্তি আকা আছে। মন্ত্রও লেখা আছে অনেক। এবা বুদ্ধ ও বদ্রীনাবাযণ দু'য়েরই পূজাবী। মানাগাঁয়ের লোকেবাই তীর্থ-যাত্রীদেব গাইডেব কাজ করে।

মানাগাঁও পাব হযে কেশবপ্রযাগ। এই প্রযাগে প্রবল বেগে সরস্বতী এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে অলকনন্দায়। দুই ধারার সংঘাতে কেশবপ্রয়াগ যেন এক অবিচ্ছিন্ন শব্দতরঙ্গে ডুবে রয়েছে।

প্রয়াগের মুখেই একটি গুহা। ঐ গুহায় একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বাস করেন। নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্বে নির্জন তাঁর গুহাশ্রমটি।

সরস্বতীর ধারা প্রয়াগ থেকে এক ফার্লংয়ের বেশি দেখা যায় না। হিমালয়ের কোন্ এক সুদূর হিমস্তরে নাকি এর উৎস। কিন্তু বাইরে থেকে সরস্বতীর স্রোতধারার কোনো চিহ্ন নেই। মাইলের পর মাইল কঠিন পর্বত ভেদ করে পাতাল পথ বয়ে এসেছে সরস্বতী। বদ্রী-অঞ্চলে এসে অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড ঝরনার মত ফেটে বেরিয়েছে সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে। সরস্বতীর মুখটি তাই দেখতে জলপ্রপাতের মতো। বড় বড় শিলাপিণ্ডগুলি সব সময়েই যেন থর থর করে কাঁপছে এখানে।

সরস্বতী যেখানে বাইরে আবির্ভূত। তারই মুখে সেতুর মত পড়ে রয়েছে একটি বিরাট পাথরের চাপ। লোকেরা এই সেতুর নাম দিয়েছে ভীমপুল। ভীমপুলে বসে বসে দেখা যায় কঠিন পর্বতের বক্ষ ভেদ করে কি দুরন্ত বেগে আবির্ভূত হয়েছে সরস্বতী। প্রপাতের আঘাতে সরস্বতীর জলকণা বাষ্পায়িত হয়ে চারিদিকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর সেই বাষ্পপুঞ্জের বুকে নিশ্চল হয়ে ভেসে রয়েছে ছোট্ট একটি রামধনু।

পরদিন ভোরে উঠে গেলাম নীলকণ্ঠে। নীলকণ্ঠ বদ্রীপুরী থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে। এমনিতে কোনো রাস্তা নেই। ঋষি-গঙ্গার কুল বয়ে পাথর ভেঙ্গে যেতে হয়।

দক্ষিণে উর্বশী পর্বত। উত্তরে নারায়ণ পর্বত। মাঝখানে প্রায় এক মাইলের মত প্রশস্ত একটি উপত্যকা। পাঁচ ছ'মাইল গিয়ে শেষ হয়েছে নীলকণ্ঠের পাদদেশে। এই উপত্যকার উপরেই বইছে ঋষিগঙ্গা। উর্বশী পর্বত, নারায়ণ পর্বত ও নীলকণ্ঠের সমস্ত জল-

ধাবা ঋষিগঙ্গায় প্রবাহিত হয়ে নেমে এসেছে অলকনন্দায়। ঋষি-গঙ্গাই নীলকণ্ঠে যাওয়ার পথচিহ্ন। গভীর নয় বলে খুব স্রোত সত্ত্বেও স্থানে স্থানে ঋষিগঙ্গা হেঁটেই পার হওয়া যায়।

নীলকণ্ঠেব উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা। এ-শৃঙ্গে এখনো কোন অভিযাত্রী উঠতে পারেনি। দূব থেকে নীলকণ্ঠ দেখে মনে হবে যেন বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গীব একটি নৃত্যমুদ্রায় দণ্ডাযমান নটবাজ। পবত শিখরেব একটু নীচে একটি কালো বিন্দু। কোনো রূপান্তব নেই। যেন নীলকণ্ঠেব কণ্ঠচিহ্নের মত। কণ্ঠে এই বিন্দু-চিহ্নটির জন্যই বোধ হয় পর্বতেব নাম হয়েছে নীলকণ্ঠ। শিখরেব একটু নীচে নীলকণ্ঠের গায়ে দেখা যায় সাদাকালোব আলোছায়া। হিমস্তব ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। আব তাব ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাথরের নিকষ কালো রূপ। সূর্যরশ্মিতে সাদাকালো ছুটো বর্ণই মিলেমিশে যখন জ্বলজ্বল করে ফুটে ওঠে নীলকণ্ঠ তখন সত্যি অপরূপ।

বদ্রীনাথ থেকে প্রথমে অনেকখানি চড়াই ভেঙ্গে উঠতে হয় উপবে। তাবপবে ঋষিগঙ্গাব ধাবা বেয়ে ধীবে ধীবে উঠতে হয় উপবেব দিকে। উপবে ঋষিগঙ্গাব উপত্যকাব মুখেই ছোট্ট একটু কুঞ্জবন। গড়ে উঠেছে আপনি থেকে। পাহাড়েব গা থেকে নেমে কতকগুলি ছোট ছোট জলধাবা বয়ে চলেছে কুঞ্জবনে। উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু কলকল সুরের মিঠে গুঞ্জনে ভবা। তৃণগুল্মগুলি মখমলেব মত কোমল ও মসৃণ। জলধারার মাঝে মাঝে এক একটা পুঞ্জ পুঞ্জ তৃণকুঞ্জ যেন রাঙা মেঘের হালকা টুকরোর মত ছড়িয়ে আছে উপত্যকার মুখটিতে।

ছেলেমানুষের মত বহুক্ষণ ছুজনে বসে রইলাম একটা কুঞ্জবনে। শান্তধারার কলগুঞ্জন মনের কোণে কোণে যেন পাহাড়ী গানের সুরভি ছড়িয়ে গেলো।

যতই এগিয়ে চলেছি ঋষিগঙ্গাও বহুধারায় ছড়িয়ে পড়ছে। উর্বশী পর্বত থেকে নেমে আসছে একটির পর একটি ঝরনাধারা। হিমস্তরও নেমে আসছে অনেকগুলি। নারায়ণ পর্বত ও থেকে ঝরনা বইছে। কিন্তু হিমস্তব নেই। লোকেরা বলে উর্বশী পর্বতের উপরে নাকি একটি সুন্দব সরোবর আছে। কিন্তু কেউ এখানে উঠতে পারেনি। সোজা খাড়া হয়ে উঠেছে উর্বশী পর্বত। এ-শিখরে ওঠা এখনও সম্ভব হয়নি।

উর্বশীর জন্ম সম্বন্ধে লোকেরা একটি সুন্দর গল্প শোনায় এখানে।

এই নীলকণ্ঠ উপত্যকায় বসে একদা নারায়ণ ধ্যান করছিলেন। তন্ময় নারায়ণের নীলতনু। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন তিনি।

ধ্যানের এমনি নিবিড়তা দেখে দেববাজ ইন্দ্র খুব ভয় পেয়ে গলেন। এত যে ধ্যান, নারায়ণ কি অসম্ভব কিছু ঘটিয়ে দেবেন নাকি? কি জানি শেষে কি হয়! নারায়ণেব ধ্যান ভেঙ্গে দাও!

মলয় ও পুষ্পের দেবতাদের আহ্বান করলেন দেবরাজ এবং স্বর্গের অপ্সরাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন নারায়ণের ধ্যান ভাঙ্গবার জন্যে।

অকস্মাৎ নীলকণ্ঠ উপত্যকায় মলয়ানিল বইতে শুরু করলো। পুষ্পে পুষ্পে সুরভিত হয়ে উঠলো চারিদিক। অপ্সরার নূপুব নিক্কনে আর ললিতকণ্ঠের মদির তরঙ্গে সুমধুর হয়ে উঠলো দিগাঙ্গন।

নারায়ণের ধ্যান-বিভোর আঁখিপল্লব ইষত্নুন্মুক্ত হলো। তিনি অনুভব করলেন ইন্দ্রের ছলনা। অপ্সরাদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে নিজের উরুদেশ একটু চিরে দিলেন। অমনি আবির্ভূত হলো এক:অনিন্দ্যসুন্দর রমনী। তার রূপের লাবণ্যে প্লাবন বয়ে গেল চারিদিকে। নৃত্যে ও কণ্ঠে সুধার তরঙ্গে মন্থন শুরু হলো। আঁখি দুটিতে তার চিত্তবিমোহনের আমন্ত্রণ। সুতরল বেশবাসে

সমস্ত অঙ্গ দীপ্তিময়। এই উর্বশী! 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ রূপসী উর্বশী!'

উর্বশীর সামনে অপ্সরাদের আঁখি লজ্জায় নত হয়ে গেল। ম্লান হয়ে গেল তাদের রূপের গর্ব। তারা গিয়ে ক্ষমা চাইলো নারায়ণের কাছে। সুন্দরী যে শুধু স্বর্গের অপ্সরাই নয়—জানুক ইন্দ্র সেকথা! নাবায়ণ উর্বশীকে পাঠিয়ে দিলেন ইন্দ্রের কাছে।

যোগী নারায়ণেব অপূর্ব কান্তিতে ইন্দ্রের অপ্সরারা বিমুগ্ধা। নয়নে তাদের মিনতি। সলজ্জ কণ্ঠে বব চাইলো তারা নারায়ণের কাছে। নারায়ণ যেন গ্রহণ করেন অপ্সরাদের। অপ্সরারা আর স্বর্গে ফিরে যেতে চায় না।

নাবায়ণের ববে শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই অপ্সবা রমণীবাই হলেন বৃন্দাবনের রসনন্দিনী গোপবালা।

নীলকণ্ঠ উপত্যকা উর্বশীর জন্মভূমিই বটে। এমন স্থানে এমন কল্পনা না হলে কি আর কবি-কল্পনা! বনতুলসী আব ধূপপাতার গন্ধে চাবিদিক আমোদিত। যতই এগিয়ে চলেছি শুধু ফুল আর ফুল। কত যে বর্ণ আব কত যে পল্লব! লাল নীল সবুজ গোলাপী বেগুনী হলুদ। এর পবে রঙেব আব নাম নেই। প্রকৃতিব প্রকাশ দিয়েই এর পরে প্রকৃতির পরিচয় দিতে হয়। আর বর্ণনা? বর্ণনাও নেই, কিন্তু বর্ণ ও বৈচিত্র্য আছে অনেক।

এত ফুল আব এমন অপূর্ব গঠন! ফুটে ফুটে যেন আলো করে রেখেছে চারিদিকের বুনো কুঞ্জ। বিচিত্র ঝবনা। ঋষিগঙ্গার বহুধারা। হিমানীর অবতরণ। অবিন্যস্ত শিলাখণ্ড। এরই মাঝে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র পুষ্প-কানন।

বদ্রীনাথের শৃঙ্গারেব জন্য পাহাড়ী মেয়েরা প্রতিদিন এখান থেকে বনতুলসী আর পুষ্পসম্ভাব তুলে নিয়ে যায়। দেখি আব মনে হয়

যেন সারা পুষ্প বনটাই তুলে নিয়ে যাই সমতল ভূমিতে। কিন্তু এ শোভা তো উন্মূলনের জন্য নয়। শুধু অনুভবের জন্য। শুধু একটি মাত্র কুসুম তুলে নিলাম। নীলমণি। কোমল পল্লবে সুনীল বর্ণ। কোরক হরিদ্রাভ। পরাগে কৃষ্ণচ্ছটা।

সারথী তো শিশু হয়ে গেলো। একবার এ-ফুল আরবার ও-ফুল। রঙ তুলি সঙ্গেই ছিল। ওর আঁকার আর বিরাম নেই। কিন্তু ও-ফুলের রং !······কোন্ তুলিতে ধরা দেবে তার প্রতিফলন ! এগিয়ে যাচ্ছি। পুষ্পবনও এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টি পড়ছে। তবু গিয়ে পৌঁছলাম নীলকণ্ঠের পাদদেশে। চারিদিকের জল বাতাসে সবই তীব্র ঠাণ্ডা। বর্ষার ধারাও তেমনি। চলতে চলতে এ-গুহা থেকে ও-গুহায় আশ্রয় নিলাম।

উর্বশী-বনে মন এমন উষ্ণ হয়ে উঠেছে যে এমন শীতে-বর্ষায় ভিজেও কাঁপুনি উঠলো না। বৃষ্টি নামছে, থামছে। কুয়াসা কেটে একটু ফর্সা হয়, আবার কুয়াসায় চারিদিক ছেয়ে যায়। কুয়াসার এই পট পরিবর্তনে পাহাড়ের বর্ণান্তব দেখবাব মত। চলতে চলতে কখনো মনে হয় উর্বশী পর্বত এই পুষ্পকাননেব মাঝে বুঝিবা উর্বশীরূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেন ওই কুয়াসাব বস্ত্রাবরণেব আড়াল ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে ওর অপরূপ অঙ্গ বেখা। কুয়াসা কখনো তরল কখনো ঘন। কখনো সূর্যের ছোঁয়া পেয়ে আলো ঝলমল, কখনো স্তিমিত। উর্বশীর যেন কোন বসনেই মন ওঠে না। তাই চলেছে একটির পর একটি করে বসন বদল। চেয়ে চেয়ে যেন মিলিয়ে দেখছে কোন্ বসনে মানাবে তাকে নীলকণ্ঠের নৃত্যারতিতে।

শিল্পী সারথীর তো উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। ফড়িঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে চারিধারে। আর বৃষ্টি থেকে কোথাও একটু .আড়াল পেলেই ওর তুলি মুখর হয়ে উঠছে।

পকেটে কিছু ফল ছিল। তাই দিয়ে দুপুর কাটিয়ে বিকেলে ফিরে এলাম বদ্রীনাথে। মাত্র বার মাইল যাতায়াতে কেটে গেল সারা দিনটা। বদ্রীনাথের বিশ্রাম-ঘরে এসে ঢুকলাম প্রায় সন্ধ্যায়।

কিন্তু নীলমণি! উর্বশীবনের পরশটুকু!···আছে, শুধু বৃন্ত টুকু! সলজ্জ নীলমণির সুনীল পল্লব কখন যে ঝরে পড়ে গেছে ওই কুঞ্জবনের পথে!

সাধুদের পরম তীর্থ এ হিমালয়। একান্ত ভাবে আত্মমগ্ন হওয়ার নিরালা পরিবেশ। এদিকে সাধুরা আসেন নীরবে ধ্যান-ধারণা করার জন্য। তীর্থস্থানে অথবা কাছাকাছি কোথাও বেছে নেন একটা কুঁড়ে ঘর কি গুহা। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনেন কাছের কোনো ধর্মশালা থেকে।

বদ্রীনাথে স্থায়ী সাধু আছেন জন ত্রিশের মত। মন্দিরের ঘরে থাকেন অনেকে। অলকনন্দার তীরেও কারো কারো কুটির। কাছাকাছি গুহায়ও থাকেন কেউ কেউ।

সারথীর সঙ্গে চল্লাম অলকনন্দার ওপারে। সাধুদের স্কেচ করে করে সারথী আগেই তাঁদের অনেকের সঙ্গে ভাব করে রেখেছে।

অনেক সাধু এসে জমায়েৎ হয়েছেন এক ঘরে। একটা বেসুরো ভাঙ্গা হারমোনিয়াম। ছোট একটা ঢোল, আর মন্দিরা। তারই সমবায়ে ভজন চলছে। দক্ষিণ ভারত থেকে একজন সাধু এসেছেন। তিনি দুপুরে ভাগবত পাঠ করেন। আর বিকালে তাঁর কুটিরে ভজন গান হয়।

অচল ভজন গান করাটা যে এমন কাজে লাগবে! একদিনেই সাধুসঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ পেলাম ওই ভজন গানের

ভুজিয়া দিয়ে। ভজন শেষ হতেই অবধূত মহারাজ বলে উঠলেন, আপ্ ভী তো বহুৎ গুণী হ্যায়!

মনে মনে ভাবি : আহা! এমন গুণীটিকে কি আর কেউ চিনবে!

ভজন শেষ হতেই গল্প শুরু হল।

দেখেছো সব চারিদিক ঘুরে? শুধু মন্দির দেখলে কি হবে? দেখ লো, চারোঁ তরফ ফৈলা হ্যাঁয় বদ্রীবিশালা। বললেন অবধূত মহারাজ।

তিনিও খুব ঘুরে বেড়ান। কৈলাসমানসেও গেছেন। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী থেকে বারকয়েক বদ্রীনাথে এসেছেন বরফের দুর্গম পথ পার হয়ে।

দোহারা চেহারা। কালো। লম্বা। চুলগুলি ঝুলে পড়েছে কাঁধের দুপাশে। পরনে শুধু একটি কৌপীনমাত্র। বদ্রীনাথের এই তীব্র শীতেও তিনি আর কিছু গায়ে দেন না। আর কি নাম আছে জানি না। সবাই বলে—অবধূত মহারাজ।

ক্যায়া আপ্ ভী কম্যুনিস্ট হো?—সকৌতুক প্রশ্ন অবধূত মহারাজের ঠোঁটে।

সব ছেড়ে এমন একটা খাপছাড়া প্রশ্ন কেন! আমাদেরও আগ্রহ হল প্রশ্নের উৎসটা জানবার জন্য।

অবধূত মহারাজ নিজেই বললেন : ফির সাল এক বাঙ্গালী আয়ে থে। বহুত চালাক। আওর আপ্‌নে কো সাম্যবাদী বতায়া। রুশকা ভারী ভকৃত। সাধুয়োঁ সে মিলতে হী তক্‌রার্ কী উলঝন। ···বহুৎ জোশ সে বলতে থে কি রুশ মেঁ সাম্য হো গয়া।

সাম্য হো গয়া! তাজ্জব কী বাত!—হম ফির্ পুছে।

ওহ্ তো বহুত জোরসে দোহ্‌রায়া······তো ক্যাঁয়ু নহী! সবকো রুটি মিল্‌তি। পহনে মিল্‌তা। রুজি মিল্‌তি·········ঘর ভী'·········

হম্ সব তো হো হো করকে হস্ পরে।······তো ইযে হী আপ কা সাম্য ?

বলতে বলতে অবধূত মহারাজের স্বর যেন একটু গাঢ় হয়ে উঠলো।

সাম্য ? খাওযা-পরার সাম্য। কাজ করো, খেতে পাবরে পরতে পাবরে—এই সাম্য ? ··সোহং। সোহং।·····মানুষের ভিতর একাত্মবোধ—এই যে পরম সাম্য ভারত অনেক আগে সন্ধান পেয়েছে এ-সাম্যের।

খানে আউর পহনে কী একতা মেঁ নেঁহী। মনুষ্য মেঁ প্রেম কি সমতা—আত্মা কি সমতা—যহ্ হঁী সাচ্চা সাম্যবাদ।

অবধূত মহারাজের আলোচনা সুতীক্ষ্ণ। ইংরেজী জানেন না। কিন্তু সব বিষয়েই সতর্ক চেতনা এবং বুঝবারও সহজ ক্ষমতা।

কোনো কোনো নেতার প্রতি সাধুরা বড় বিরূপ। ভারতের আত্মার যারা সন্ধান জানে না তারা আবার ভারতের নেতা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উক্তি করেন সাধুরা।

দক্ষিণ ভারতী সাধু রাজনীতির প্রসঙ্গে তুললেন নেতাজীর কথা। সবাই যেন সমস্বরে বলে উঠলেন, হ্যা। অগর নেতা হো তো সুভাষ বোস। ক্যাসা বাহাদুর।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছি। শুধু গাড়োয়ালের জনসাধারণ নয়, সাধুরা পর্যন্ত নেতাজীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে দেবমূর্তি ছাড়া আর কোনো মূর্তি নেই। কিন্তু গঙ্গার পারেই রয়েছে নেতাজীর একটি মর্মর-মূর্তি। বাঙ্গালী দেখলেই যেন সাধুদের মুখেও নেতাজীর দু'একটি কথা উঠে পড়ে। কেদারনাথের সেই শান্ত বৃদ্ধ সাধুও বললেন, 'অগর সুভাষ বোস জিন্দা হ্যা তো কাঁহীয়্ নঁহী লোটতে ? হিন্দুস্তান কি অ্যাসা নাজুক

৭

জমানা মেঁ ওহ্ বাহাদুর ক্যাসে ছিপা রহ্ সাকতে? এখানেও সাধুদের সেই কথা। বাহাদুর নেতা সুভাষ বোস!

প্রসঙ্গটা মোড় নিলো। সারথী প্রশ্ন করলো: সংসার যদি ভগবানেরই সৃষ্টি তবে কেন এমন সুখ-দুঃখের চির-সংঘাত?

সুখ-দুঃখ তো তোমার মনের অনুভূতি। ভগবানের কাছে ও দুটোই অর্থহীন। হাসিমুখে জবাব দিলেন অবধূত মহারাজ।

অনেক প্রশ্নোত্তর হলো। রাগলেন না। শেষে শুধু হেসে বললেন: কথা শুনেই বিশ্বাস করো না। যেচে নিও। সাধুদেব কথা হলেও। কিন্তু কাউকে ঠকাবার জন্য যেন প্রশ্ন কবো না।... আর শুধু বুদ্ধি দিয়ে কত কুলোবে।...বিনা সাধন ন মিল্‌তা ওহ্ বামরতন!

অবধূতজী রাতে শোন একটি কাঠের বাক্সে। একহাত চওড়া এবং লম্বা তাঁর পা পর্যন্ত। একটি গীতা, একটি কমণ্ডলু—এই দেখলাম তাঁর কুটিরের সামগ্রী। কৈলাস মানস কুমায়ুঁ—হিমালয়ের কোনো হিমতীর্থই বাকি নেই। বদ্রীনাথের মত শীতেও যে খালি গায়ে থাকেন তা' নিয়েও বড়াই নেই। উল্লেখ করলে হেসে বলেন: অভ্যাস! ও সব ঝেড়ে ফেললে জীবনটাও সহজ হয়ে যায়। এতে মাহাত্ম্য নেই কিছু।

কিন্তু ভক্তরা সেকথা মানে না। বদ্রীনাথের মত কঠিন শীতে এমন খালি গায়ে থাকার জন্য অবধূত মহারাজের প্রতি সবারই বিশেষ আকর্ষণ।

না না না! ও শালাদের পয়সা দেবেন না! আরে ও শালারা কি মানুষ! খালি পয়সা আর পয়সা! সত্যানন্দ মহারাজ আমাকে সতর্ক করে দিলেন পাণ্ডাদের সম্বন্ধে।

বদ্রীতে খাবারের কোনো অসুবিধে নেই। টাকা দিয়ে ভোগেব

জন্য নাম লিখিয়ে আসতে হয় আগেব দিন। পরেব দিন হাঁড়ি-ভবা প্রসাদী ডাল ভাত বা খিচুড়ী মিলে যায়। পাণ্ডাবা এসে টাকা নিয়ে যায়। বিনিময়ে প্রসাদ এনে দেয় যাত্রীদের।

ওবা প্রসাদ আনে না ছাই! এড়াবটা দেড়া নেবে। তাও যদি প্রসাদ হতো।······আমি এনে দেব 'খন প্রসাদ আপনাকে।

সত্যানন্দ মহাবাজই প্রসাদ এনে দেন। কম্বলেব ছেঁড়া আলখাল্লাটাব নিচে ঢাকা দিয়ে। পাণ্ডাদেব চোখে যেন না পড়ে।

কালো লম্বা। চোখ দুটো কোটবে। পুরু চশমা। কথায কথায ইংবেজী বলেন। ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই শুনিয়ে দেন: ঘব কবলাম না। চাকরী করলাম না। বড মার্চেন্ট অফিসেব কাজ। সেবাব কলকাতা গিয়েছিলাম। ওবা এখন সবাই অনেক বড় পোস্টে···

বাংলায কথা বলতে পেবে ভালই লাগলো সত্যানন্দ মহাবাজকে। কিন্তু বড অভিবাবকী। এ-না, সে-না। 'একে দেবেন না, ওটা কববেন না। নিষেধ আব পবামর্শ লেগেই আছে। বাতে ভোবে কি দুপুবে সব সমযে এসে তত্ত্বাবধান কবে যান।

না না অত টাকা দেবেন না। কুলী-টুলীকে আবাব অত টাকা কি! আমিই ওব খাবাব এনে দেবো। ধনসিংহেবও দোকান থেকে কিনে খাওযা বন্ধ হলো।

অবধূত মহাবাজেব কাছে যে অত যাতাযাত কবি সত্যানন্দ মহাবাজেব তাও যেন পছন্দ নয়। দু'একটি পরোক্ষ ঠোকব দেন। বদ্রীনাথে অবধূত মহাবাজেব খুব প্রভাব। তাই নিযে সাধু সমাজেও একটু আধটু মন্তব্য শোনা যায।

সাধুদেব মুখে নিন্দাবাদ শুনলে এমন বেমানান লাগে। তবুও এ দোষটা ব্যক্তি কি সম্প্রদায় হিসেবে অনেক সাধুদের মধ্যেই দেখা যায়। এক সম্প্রদাযেব সমালোচনা কবতে অন্যদেব

বাধে না। এত জপ-তপ। এত সংযম কৃচ্ছ্রতা। জীবনের সব কিছু তুচ্ছ করে ফেলে এসেছেন এঁরা। তবুও যেন সমালোচনা করার ঝোঁক থেকে এঁদেরও অনেকেই রেহাই পাননি। যেন গায়কদের মত। এত মিষ্টি গলা এত ভাব 'তবুও আর এক গায়ককে একটু খোঁচা না দিয়ে যেন খুশি নয়।

অবশ্য সবাই এমনি নন।

চলুন! চলুন! এখন গেলেই দেখা পাবো।

আসল সাধু দেখাবেন বলে আগেই বলে রেখেছিলেন। পরদিন দুপুরে এসে তাড়া দিলেন সত্যানন্দ মহারাজ। সৎসঙ্গ করে ফিরলেন। সাধুরা দুপুরে এক এক জায়গায় জমা হন। তারই নাম সৎসঙ্গ।

দূর থেকে দেখলাম অলকনন্দার পারে একটা পাথরের উপরে একজন সাধু বসে আছেন। গায়ে শততালি দেওয়া কাথার মত একটা আলখাল্লা। এজন্য নাম হয়েছে গদ্‌রীবাবা। কারো সাথে মেশেন না। একবার গিয়ে মন্দিরে প্রসাদ পেয়ে আসেন। তা'ছাড়া গঙ্গাপারের কুটিরেই থাকেন সারাক্ষণ। মাঝে মাঝে দুপুরে একটি বড় পাথরের উপরে এসে বসেন।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখটা একটু খুলে বসতে বলে মুদিত নয়নে আবার মালা জপতে লাগলেন। অগণিত পুঁতির একটি সুদীর্ঘ মালা। অবিরাম তাই ঘোরাফেরা করে চলছে আঙ্গুলের করে করে। বয়স অনেক। কিন্তু সারা মুখে শিশুর মত একটা সজল প্রশান্তি।

তীর্থ দর্শনে এসেছো? বেশ! বেশ! মহাত্মাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছো?

কথাটি বলেই আবার চোখ ও মুখ দুটোই বুজলেন তিনি।

আধুনিকতার সন্দেহ নিয়ে একটা খোঁচা দিলাম গদরীবাবাকে : মহারাজ! ভগবান যে আছেন তার প্রমাণ কি?

যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো। চোখ বুজেই তিনি ঝড়ের মত বলতে লাগলেন : দুধে যে মাখন আছে, কে জানে তা? গোয়ালা জানে। কি করে দুধ থেকে মাখন তোলা হয় তাও সে জানে। মাটির নীচে তো কত জায়গায়ই খনি আছে। কয়জন জানে তার সন্ধান? ...ভগবান যে আছেন তা জানতে হলে শাস্ত্র য পথের কথা বলে দেয় সে পথে এগিয়েযেতে হয়। তবেই জানা যায় ভগবানকে।

প্রশ্ন তিনি পছন্দ করেন না বলেই মনে হলো। তাই আর কথা না বলে শুধু বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তিনি চোখ বুজে নিজে নিজেই বহু শ্লোক বহু দোঁহা পাঠ করে গেলেন। কবীর নানক রুইদাস তাঁর কণ্ঠস্থ। বেদ এবং গীতাও।

ভক্তি আর বিশ্বাস গদরীবাবার অকপট সঙ্গী। তর্কালোচনার ধার ধারেন না। চোখ-মুখে ঘুমানো শিশুর মত আত্মসমর্পণের তদগত ভাব। ভক্তি ও ভজনেই তাঁর পরম আনন্দ।

গদরীবাবার ভগবৎ আসক্তি কি প্রবল সবাই বলে সেকথা। বহু বছর আগে একদিন ধ্যান করার সময় আকস্মিক গদরীবাবার আদি ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়ের এই বিদ্রোহে রাগে দুঃখে তিনি এমনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন যে একটা ব্লেড নিয়ে তক্ষুনি তিনি ইন্দ্রিয়ের মূলোচ্ছেদ করে ফেলে দেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে সমস্ত শরীর ভাসিয়ে দেয়। তিনিও অচেতন হয়ে পড়ে যান। ডাক্তার এসে শোনে সেই অচেতন অবস্থায়ও তাঁর ঠোঁট দুটি বিড বিড করছে : শালা! মজা দেখ্‌লো! ফির ভী অ্যায়সা করো।

বাঙ্গালী সাধুও আছেন জনকয়েক। একজন থাকেন একটু

দূরে অলকনন্দার পারে। কুটিরের আশেপাশে একটু জায়গা করে নিয়েছেন। তাতে ফল-ফুল শাক-সব্জী বোনেন। একদিন তাঁর কুঠিরে বেড়াতে গেলাম। যত্ন করে চা খাওয়ালেন। ফল-ফুল দেখিয়ে বললেন : এসব দিয়ে মাঝে মাঝে সাধুসেবা করি। ফুল পূজায় দিই।

কিন্তু এই ফল-ফুল নিয়ে এখনো তাঁকে সাধু সমাজে খোঁচা খেতে হয়। কথা শুনতে হয়—কৌপীনকে ওয়াস্তে ন হো জায় সাধুজী!

এতটকুও আপনার বলে নিতে নেই। ফলটিও না। তাতে বন্ধন এসে যায়। তিতিক্ষায় বিঘ্ন ঘটে। এই গোঁড়া সাধুসমাজেব কথা।

কিন্তু তবুও তো কিছু কিছু অর্থেরও প্রয়োজন পড়ে প্রায় সবারই। কয়েকটি ধর্মশালা থেকে প্রতিদিন সাধুদের 'ভিক্ষা' দেওয়া হয়। কিছু চাল ডাল আটা একটু ঘি কিছুটা কাঠ। মন্দিরের প্রসাদও নিতে পারেন সাধুরা। এ-ছাড়াও সবারই কিছু চায়ের প্রয়োজন পড়ে। এখানকার তীব্র ঠাণ্ডায় সাধুরাও চা না খেয়ে পারেন না। রাত্রেও শুধু চা খান প্রায় সবাই। কেউ একটু দুধও। ভক্তেরা দেয়। কারো কারো নামে দূর দেশ থেকেও টাকা আসে। ভক্তেরা মনিঅর্ডার করে পাঠায়।

সদানন্দ মহারাজ হেসে বলেন : এতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ফলফুল বোনায় নাকি বন্ধন!

সদানন্দ মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েছেন। তাই সাধু-সমাজের সব সংস্কার মানেন না।

রাতে আবার আসেন সত্যানন্দ মহারাজ। গল্প করেন। আক্ষেপ শোনান : পাণ্ডাদের হাত থেকে বাঙ্গালী যাত্রীদের একটু দেখাশোনা

করি ব্যাটাদের তাতেও কি রাগ। পয়সা নেবার জন্য নাকি আমি এসব করি। তা কেউ কেউ সাধুসেবার জন্য কিছু দিয়ে যায়। ...ব্যাটাদের তাতেই রাগ !...একটু লিখে দেবেন তো কাগজে।... একজন বাঙ্গালী সাধু যাত্রীদের খুব যত্ন করে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙ্গালী যাত্রীদের সেবা যত্ন করেন তিনি ঠিকই। কিছু দক্ষিণাও আশা করেন। যাত্রীদের প্রসাদ এনে দিয়ে পয়সা বাঁচিয়ে দেন। দানের সুযোগটা তাতে সহজ হয়। এর একটা কারণ আছে। দুই বছব থেকে এটাই হয়েছে সত্যানন্দ মহারাজের নিন্দার সূত্র।

শীতের দিনে বদ্রীনাথ বরফে ঢেকে যায়। বদ্রীবিশালের তখন পূজা হয় যোশীমঠে। কারো সে-সময় বদ্রীভূমিতে থাকাব হুকুম নেই। হুকুম পেলেও থাকা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড শীতে ও বরফে মৃত্যু সুনিশ্চিত। চৌকিদাব কখনও বা কাছাকাছি থেকে এসে দেখেশুনে তক্ষুনি আবার ফিরে যায়। দোকানীদের মাল জমা থাকে। তাই তদারক করতে আসে চৌকিদার।

কিন্তু মন্দির কর্তৃপক্ষের চোখের আড়ালে কোনো কোনো সাধু এরই মধ্যে থেকে যান বদ্রীনাথে। নিরালায় একলা জপ-ধ্যান করাব জন্য। এ দুঃসাহস করতে যেয়ে অনেকের জীবন গেছে। বোশেখ মাসে পট খুলতে এসে চোখে পড়েছে বরফের চাপে সন্ন্যাসীর নিস্পন্দ দেহ। মৃত্যুর এরূপ ভ্রূকুটি সত্ত্বেও কেউ কেউ শীতে লুকিয়ে থেকে যান। এবং অন্যেরা থাকবাব গোপন আশা পোষণ করেন মনে মনে। যারা কয়েক বছর শীতে এখানে ছিলেন তার মধ্যে তরুণ সন্ন্যাসী হলেন সত্যসন্ধ।

বরফ পড়ে সব যখন ঢেকে যায় তখন এখানে একটা পাখী কি এক ছিটে তৃণও থাকে না কোথাও। এই নির্মম নিরালা পুরীতে একলা থাকার শঙ্কাই নয় শুধু, শীতের হাত থেকে

বাঁচবার জন্য কঠোর লড়াই করতে হয়। যাঁরা থাকেন চুপে চুপে তারা ছ'মাসের মত আটা ঘি চা চিনি ও কাঠ সংগ্রহ করে রাখেন। পট বন্ধ করে সবাই চলে গেলে অলকনন্দার পারে উষ্ণ প্রস্রবণের পাশে কোনো কুঠিতে এসে আসন পাতেন। দুরন্ত অলকনন্দাও তখন কঠিন পাথরের মত বরফ হয়ে জমে যায়। এই উষ্ণ প্রস্রবণই তখন তৃষ্ণা নিবারণ ও উত্তাপ সঞ্চয়নের একমাত্র অবলম্বন।

এমনি চরম কৃচ্ছ্র,তার মধ্যে কি পান, সন্ন্যাসীরাই জানেন। কিন্তু সাধনার অতলান্তে ডুবে যাওয়ার এই দুঃসাহস পরমার্থ সন্ধানীদের আকর্ষণ না করে পারে না। তাই শীতের দিনে বরফের সমাধিতে বসে সাধন-ভজন করাকে বদ্রীনাথের সাধুসমাজে খুব মর্যাদার চোখে দেখা হয়।

সত্যানন্দ মহারাজ এবার শীতে থাকবেন এখানে। এই তাঁর ইচ্ছে। তারই আয়োজন চলছে। তিনি ধর্মশালা থেকে ভিক্ষা নেন। তাই থেকে চাল ডাল ঘি জমিয়ে রাখেন একটা দোকান-দারের কাছে। প্রসাদ এনে দেন যাত্রীদের। ফেরার পথে যাত্রীরা সাধু-সেবার জন্য দান করে যায় কিছু কিছু। তাই তিনি সঞ্চয় করে রাখছেন আগামী শীতের জন্য

এমনি সঞ্চয় করতে হয় কর্তৃপক্ষের চোখের আড়ালে। তাই তিনিও কাউকে কিছু বলেননি। ফলে, এই অন্ন ও অর্থসঞ্চয় সত্যানন্দ মহারাজের অপবাদের কারণ হয়েছে।

কোনো বসনেরই বালাই নেই এমনও একজন সাধু থাকেন উষ্ণকুণ্ডের কাছে। আগে একটু কৌপীন পরতেন। এখন তা থেকেও নির্মুক্ত। এই নিয়ে কিছু বিপদও হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ খুব মানতো আগে এঁকে। কিন্তু সুরুচির মাপে তাঁর নগ্নতাটা তারা এখন বরদাস্ত করতে পারেন না।

এ নিয়ে খুব শ্রদ্ধাবান সাধুদের মুখেও বিদ্রূপোক্তি শোনা যায়। 'অব উন্‌কা বাকী হ্যায় কিসি আওরত কা গোদ মেঁ বৈঠতে হুয়ে উস্‌কা দুধ পিনা।'

তবু তিনি নগ্নতা ছাড়েননি। তিনিও একথা স্বীকার করেন যে শিশুর মত নির্বিকারে কোনো মায়ের বুক থেকে যেদিন তিনি দুধ পান করতে পারবেন তখনই হবে তার নগ্ন-সাধনার সিদ্ধি।

বসলাম গিয়ে ওঁর ঘরে। এমনিতে মনে হলো চেহারাটি যেন একটু রুক্ষ। কিন্তু চোখ দুটিতে জ্বলছে তীক্ষ্ণ শিখা। অল্প কয়টি পোরস্তিক শব্দ বিনিময়ের পরে সোজা জিজ্ঞেস করে ফেললাম সাধুজীর নিরাবরণ থাকার কারণ।

বস্ত্র? সে তো ইন্দ্রিয়বৃত্তিকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লালন করবার জন্যই তো বস্ত্রের আবরণ। পরিপূর্ণ নগ্নতাই ইন্দ্রিয়ের বিকার থেকে নির্মুক্ত হওয়ার সত্যিকার উপায়। একটু যেন তীক্ষ্ণ স্বরেই বললেন কথাগুলি।

ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করার কি অদ্ভুত সব কল্পনা। কথা হলো ইংরেজীতে। শোনা যায় তিনি এম-এ পাশ। বিলেতেও ছিলেন কিছুদিন। ওপারের বিদেশীদের কারো কারো সঙ্গে এখনও নাকি পত্রালাপ চলে। বাঙ্গালী না মাদ্রাজী তাই নিয়ে সংশয় আছে লোকদের। তিনি সে কথার উত্তর না দিয়ে কথা বলেন শুধু হিন্দি বা ইংরেজীতে।

সাধু সত্যসন্ধ আমাদের ঘরের পাশ দিয়েই দুবেলা যাতায়াত করেন। এদিকে ওদিকে তাকান না। সোজা চলে যান মন্দিরের দিকে। দেখলেই বোঝা যায় অল্প বয়স। মুখ মসৃণ। কিন্তু এরই মধ্যে মাথা থেকে ধূসর জটা গড়িয়ে পড়েছে। গায়ে সিল্কের গেরুয়া। দেখতে খুব ফর্সা। চোখ দুটি সব সময় ভাবে ডোবা।

যানি তখনো সত্যসন্ধজীর কাছে। তবে লোকের মুখে শুনেছি খুব বড় ঘরের ছেলে। অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলেন।

সত্যসন্ধের মত আরও কয়েকজন যুবক সন্ন্যাসী আছেন। মন্দিরে যেতে আসতে দেখি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে অলকনন্দার পারে তাদের কেউ কেউ একলা বসে আছেন।

দেখি ওঁদের। আর আধুনিক মনের একটা প্রশ্ন মনকে নাড়া-চাড়া দেয়। দেহের অঙ্গনে বাস করেও কি এঁরা দেহ-বিকারের সব কিছু থেকে নির্মুক্ত? দেহ কি ওঁদের দেহের নয়? যে আদি প্রকৃতির রসায়নে সমস্ত বিশ্বের জীবোদ্গমের দুর্নিবার উৎস, তার কোনো স্পন্দনই কি থাকে না ওদের রক্তকণার নিরন্তর প্রবাহে? দেখি ওঁদের। আর প্রশ্নটা আসা-যাওয়া করে মনের মধ্যে। ওই তরুণ তাপসেরা! ওই যে প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর দল! ওরা?……

মনের আঙ্গিনায় এ-প্রশ্নটা এমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল এক তরুণ তাপসের করুণ কাহিনী শুনে।

তরুণ সন্ন্যাসী। কিন্তু সাধুরা বলেন এমন সন্নাসী নাকি বদ্রীনাথে খুব কমই আসেন। সাধনার উচ্চমার্গে তাঁর বিচরণ। পরপর কয়েকবার শীতে তিনি জপতপ করেছেন বদ্রীনাথে। পরণে শুধু কৌপীন। বদ্রীনাথের এমন শীতেও গায়ে একটু রোমাঞ্চও হয় না। আর সব নগ্ন সন্ন্যাসী যাঁরা আছেন তাঁরা শীত সহ্য করেন বটে কিন্তু তাদের শরীর হিমস্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়। এই তরুণ তাপস সাধন মার্গের এমন সীমা অতিক্রম করেছিলেন যে সহ্য নয় শুধু, তাঁর কাছে শীত-তাপের অনুভূতিও সহজ হয়ে গিয়েছিল।

কোথাও যেতেন না। কাটাতেন একা একা নিজের কুটিরে।

সাধন ভজন ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। কোনো দান, কোনো অন্ন—-কেউ কিছু তুলে দিতে পারতো না এই তরুণ সন্ন্যাসীটিকে। মন্দিরে গিয়ে দিনে একবার শুধু প্রসাদ নিতেন।

সাধু সমাজেও তাই এই তাপস তরুণের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা।

কিন্তু অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল বদ্রীনাথে। গত বছর পট বন্ধের দিনে দেখা গেলো তরুণ তাপসের নিস্পন্দ দেহ পড়ে রয়েছে মন্দিরের অঙ্গনে। সমস্ত দেহ নীল। গায়ে বিষ-ক্রিয়ার চিহ্ন।

তরুণ তাপসের এই আত্মহত্যায় সাবা বদ্রীবাসী দুঃখে ও বেদনায় অবিভূত হয়ে গেলো।

কেন এমন হল? তন্ন তন্ন করে সন্ধান করতে লাগলেন সন্ন্যাসীরা। কিন্তু যা জানা গেলো তাতে বিস্ময়ের অবধি রইল না।

তরুণ তাপস ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত। গত বছর দক্ষিণ ভারত থেকে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসিনী আসেন। সুস্নিগ্ধ-দর্শনা। ব্রজ-মাধবের পরম ভক্ত। ভজন আর তিতিক্ষা, এই ছিল তার জীবনের অবলম্বন। ভক্ত তাপসিনীর সঙ্গে পরিচয় হয় ভক্ত তাপসের। এ-পরিচয় পারস্পরিক সৌহৃদ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। হৃদয়াবেগের রন্ধ্রপথে পুনরাঙ্কুরিত হয়ে ওঠে আদি প্রকৃতি। তারই সম্মোহনে তরুণ তাপসের তপস্যাস্নিগ্ধ মনও হয়ে ওঠে বিলোলিত।

এমনি চলে কিছুদিন। এই মোহ নিদ্রা থেকে আকস্মিক একদিন আবার জেগে ওঠেন তরুণ তাপস। আত্মধিক্কারের সেই প্রতিক্রিয়া তাকে ঠেলে দেয় এই মর্মান্তিক পরিণামে।

তবে! এত সাধনাও যাঁকে দেহের আবেদন থেকে নির্মুক্তি দিল না! সন্ন্যাসীদের এই বৈরাগ্য কি তবে শুধুই রক্তের নিপীড়ন? শুধুই কৃচ্ছ্রতা?

আধুনিক মনোবিজ্ঞান জোর গলায় বলবে, সংযমের অর্থ নিপীড়নের বন্ধনে দেহের সজীব রক্তকণাকে নির্মমভাবে শুধু নিস্পন্দ করে দেওয়া।

সাধুদের কাছে অকপটে তুলে ধরেছি এ-প্রশ্নটি। অনেকে মিষ্টিক ভঙ্গিতে একথা সেকথা বলে এড়িয়ে গেছেন। কেউ কেউ খুব নিঃসংকোচে উত্তর দিয়েছেন।

একটি গল্প শুনিয়ে বল্লেন একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। এক উত্যক্ত তরুণ অস্থির হয়ে একদিন তার অশীতিপর পিতামহীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আদিবৃত্তির প্রবাহ থেকে কি কোনো রেহাই মানুষের জীবনে নেই?

পিতামহী উত্তরের জন্য তাকে আসতে বললেন পরদিন।

দ্বিতীয় দিনে তরুণ এলো। একটা বন্ধ কৌটো তরুণের হাতে দিয়ে পিতামহী বললেন: খোলো!

একটির পর একটি করে খাপে খাপে সাজানো অনেকগুলি কৌটো বের হলো পর পর। শেষ কৌটোতে বেরুলো এক মুঠো শুধু ছাই।

তরুণের চোখে বিস্ময়ের প্রশ্ন।

পিতামহী সস্নেহ উত্তরে বল্লেন: দেহ ছাই না হওয়া অবধি এ-বৃত্তির হাত থেকে একান্ত মুক্তি নেই কোনো মানুষেরই।

সাধুরা বলেন, সংযম ও তিতিক্ষা হলো অবদমনের পথ। প্রথমে এ-পথেই এগিয়ে যেতে হয়। উত্তেজনার ইন্ধন হতে দূরে দূরে থেকে। এই অবদমন আনে উদাসীনতা। কিন্তু যারা অধ্যাত্ম সাধনায় এগুতে পারেন না, এই উদাসীনতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে বিক্ষোভ। আর যারা সাধন-ভজনের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন, তাদের মধ্যে এই অবদমন ও উদাসীনতা রূপান্তরিত হয় মনের এক নূতন রসানুভূতিতে।

সন্ন্যাসীরা আদিবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বেশি জোর দেন এ-জন্যে যে মন যদি আদি আবেদনে সাড়া দেওয়ায় জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে তবে অন্য স্তরের অনুভূতি লাভে তা হয় ব্যর্থ। যদি বা অন্য স্তরের ভাবতরঙ্গ মনের আঙ্গিনায় ক্ষণিকের জন্য স্পর্শও দিয়ে যায়, তাতেও সমস্ত সত্ত্বা রসাপ্লুত হয়ে ওঠে না। মন আবার দেহের অনুসারী হয়ে ওঠে। মনের বিভিন্ন স্তরের পল্লব একটির পর একটি করে উন্মুক্ত হলে তবে আসে ভাবান্তরের পথে আধ্যাত্ম রসের পরম উপলব্ধি। এ-রসের আস্বাদন নাকি আদিরসের চেয়েও অনেক মধুর।

এক নব বিবাহিত আমেরিকান দম্পতি স্বামী বিবেকানন্দকে এক সময় কটাক্ষ করে বলেছিল: তুমি সন্ন্যাসী! তুমি কি জানো ইন্দ্রিয়ের আস্বাদন?

বিবেকানন্দ তার উত্তরে বলেছিলেন: আমি? আমার প্রতি রোমকূপে সহস্র রমণের আনন্দ উপভোগ করি আমি! তোমরা কি জান তার আস্বাদ?

বিবেকানন্দ কি এই রসাস্বাদনের কথাই বলেছিলেন সেই তরুণ দম্পতিকে।

বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন সন্ন্যাসীদের কথা অবিশ্বাস করতে পারিনি। অন্তত ভারতের মানুষেরা তা পারবে না। শুধু অবদমন হয়তো বিকৃতি ঘটায়। কিন্তু আদি অনুভূতির রূপান্তর আনে নূতন তৃপ্তি ও এক অনাস্বাদিত রসবোধ। নইলে অলকনন্দা পারের ওই যে কত সন্ন্যাসীর সৌম্য-মধুর ভাব, চিত্তের প্রশান্তি, একি শুধুই অবদমিত মনের কপট ছলনা?

কপটতা যে ছলনা নিয়ে আসে সে তো বহু অন্তচরের সহযাত্রী! কই সে সহযাত্রীর লক্ষণ তো দেখা যায় না ওঁদের মধ্যে!

হরিদ্বার থেকে দেখে আসছি গেরুয়া পরা-অগণিত সন্ন্যাসীর দল। সারা ভারতে হয়তো কত শত হবে এদের সংখ্যা তার গণনা নেই। কিন্তু এরা কি সবাই পায় আত্মার পরিতৃপ্তি ?

কে পেয়েছেন অজানার সন্ধান তার সন্ধান পাওয়া কঠিন। শাস্ত্র বলে যাঁরা জানা অজানার বাইবে তাঁদের নাকি অদ্ভুত ভাব। কেউ নির্বোধ কেউ পাগল কেউ স্তব্ধ কেউ অশ্রুসিক্ত কেউ সদাশিশু কেউ নির্বিকার। জহুরী না হলে নাকি এ-রতন চেনা যায় না।

কয়দিন কেটে গেলো বদ্রীনাথে। কিন্তু সত্‌পন্থ্‌ যাওয়ার সুযোগ হলো না। সাধুদেব সঙ্গে ঘুবে বেড়াই। ভাঙা ভাঙা ভজন শুনাই। আর তাঁদের গল্প শুনি। কিন্তু মনটা উসখুস করতেই থাকে।

সত্‌পন্থ্‌ যাব না! এমন আর কি দূরে! সত্‌পন্থ্‌ আর স্বর্গা-রোহণ মাইল কুড়ি পঁচিশ হবে বদ্রীনাথ থেকে। এতপথ একলা এলাম আর এ-টুকু যাব না!

কিন্তু সত্‌পন্থের কোনো পথ নেই। বড় দুর্গম। উঁচু কোথায়ও ষোল হাজার ফিটের উপরে। সুপরিচিত গাইড চাই। যাতা-য়াতেও দিন কয়েক লাগে।

লোকেরা নানা শঙ্কাব কথা বলে। কোন্ কোন্ যাত্রী ও-পথে প্রাণ খুইয়েছে। কোন্ সাধুকে বরফ-চাপা অবস্থায় পাওয়া গেলো এক বছর পরে। অনেক কথাই বর্ণনা করে শুনায়। তবুও কথাব শেষে রেশ টেনে বলে—অ্যাসা খতরনাক হোনে সে ভী দেখ্‌নে মে বহুৎ আনন্দ আতা। অ্যাসা তীবথ্‌ কাঁহা ভী নহী মিলতা।

সত্পন্থ্। হিমালযেব বুকে প্রকৃতিব অকৃত্রিম অপূর্ব একটি তীর্থস্থান।

কথা শুনে আকর্ষণ আবো বেড়ে যায়। এধাবে ওধাবে সহযাত্রী খুঁজি। না। বদ্রীনাথ থেকেই বুঝি ফিবে যেতে হলো।

ফেবাব দিন কযেক আগে একটু যেন আশাব বেখা ফুটলো। একজন বাঙ্গালী এসেছেন। কালই সত্পন্থ্ যাবেন। টেণ্ট-কুলী গাইড—সব তার ঠিক।

একেবাবে লাফিয়ে গিযে পড়লাম তাব কাছে। একে বাঙ্গালী, তা ছাড়া জনপ্রাণীহীন এই পর্বতসমুদ্রে বাংলায কথা বলাব একটি সঙ্গীও তো পাবেন। সত্পন্থে যাওযাব সুযোগ বুঝি হলো তবে। জয় বদ্রীবিশাল।

দুচাবটি কথা হতে না হতেই আব তব সইল না। বাঙ্গালী মহাশযকে সোজা বলে ফেল্লাম —আপনাব সঙ্গী হতে চাই যে।

কিন্তু। বাঙ্গালী মহাশযেব মুখ-নিঃসৃত শব্দটায একটা ঠাণ্ডা দ্বিধার ঝাপটা খেলাম যেন। তপ্ত কডাইযে যেন জলেব ছিটে পডলো।

তবুও কাচুমাচু হযে চেযে বইলাম তাব দিকে। দেখি কি বলেন।

আপনি যাবেন সে তো খুবই আনন্দেব কথা। কিন্তু বড যে কষ্ট ও-পথে।

নানা কষ্টেব কথা তুলে নিবৃত্ত কবাব চেষ্টা কবলেন আমায। তবুও আমি যেন নির্লজ্জেব মত নাছোডবান্দা। আবাব আবো কিছু বাধাব কথা তোলেন। তাই আগে থেকেই জানিযে দিলাম, আমাব খবচ আমিই বহন কববো। এমন কি ধনসিংকেও সঙ্গে নিযে যেতে পাবি মাল বইবাব প্রযোজন হলে।

কিহে! আরেকজনের মত জায়গা টায়গার সুবিধা হবে টেন্‌টে ?

পাণ্ডা গাইডকে জিজ্ঞাসা করে সংকুচিত চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তার অনেকদিনের পরিচিত পাণ্ডা। মুখের চেয়ে চোখের ভাষা বুঝে নিতে দেরী হলো না পাণ্ডাটির।

ছে কুলি। ছোটা টেন্‌ট। আউর কিসিকা জায়গা হোনা তো বড়া মুস্কিল বাবুজী!

কথাটা শুনে জলেভেজা বেড়ালের মত বসে রইলাম কিছুক্ষণ। শ্রীবাঙ্গালী মহাশয় একটু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন : বুঝলেন না! আপনাকে নিয়ে যাওয়া সে তো কত আনন্দের কথা।... কিন্তু কত যে অসুবিধে! বুঝলেন না!

বুঝলাম সবই।

এত ঠাণ্ডা বদ্রীনাথেও মাথাটা এমন গরম হয়ে গেলো! সোজা চলে এলাম সারথীর ঘরে।

কালই সত্‌পন্থে যাব। যাবে না তুমি ?

সারথী তো আগেই রাজী ছিল। কিন্তু যে সমস্যার জন্য আগে যাওয়া হয়নি তার সমাধানের উপায় জানবার জন্য সারথী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সে ঠিক হবে 'খন। বলে চলে এলাম আমার বিশ্রাম ঘরে।

রাতভর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুমে বার বার ভাবতে লাগলাম : উপায় কি! উপায় না পেয়ে পিছ্‌-পা হতে যাই তো শ্রীবাঙ্গালী মহাশয়ের প্রত্যাখ্যানটা যেন চাবুক মারে এসে। সারা রাতটাই এমনি কাটলো।

চলো! চলো! অবধূত মহারাজের কাছে যাবে না। ভোরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাড়া দি গিয়ে সারথীকে।

পথে পথে ওকে শিখিয়ে নিলাম। আর বললামও ওকে কালকেব সব কথা।

না শুনেই কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হবে মহারাজ! কথা দিন

দুজনেই আবদার করে ধরে পড়লাম গিয়ে অবধূত মহারাজকে।

সাওয়াল পুছনে কা ভী যুবসৎ নহী অবধূত মহারাজের চোখে সকৌতুক দৃষ্টি।

আজই আপনাকে সত্‌পন্থ্ যেতে হবে। আমরা যাবো আপনাব সঙ্গে।

একটু ইতস্তত করলেন অবধূত মহাবাজ। অলকনন্দায় স্নান সেরে এসে রোদে বসে মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলি শুকোচ্ছিলেন।

কাল রাত কো জ্যরা বুখার হুয়া থা। জ্যরা শাসন করনে মাঙ্গতা জব ভগবান! -একটু কৌতুকের হাসি হেসে কথাটা শেষ করলেন· সো ঠিক হ্যায়। দুপহর কে অন্দর তব তৈয়ার হো যাও!

খুশিতে দুজনে উছলে উঠলাম। কথা নিয়ে শেষে বললাম কাল বিকালেব কথা। শুনে বললেন: তব তো জরুর দেখা দেনা হোগা—হম ভী যা সাকতে।

প্রতিযোগিতার হালকা আমেজ লাগলো অবধূত মহারাজের মধ্যেও।

বদ্রীপুরীতে সবাই শুনে তো অবাক! অবধূত মহাবাজ যাবেন আমাদের নিয়ে! বদ্রীপুরীতে অবধুত মহারাজেব প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা। পাহাড়ে গুহায় দুর্গম স্থানে বহু ধ্যান জপ করেছেন তিনি। সত্‌পন্থের পথও তার নখাগ্রে। এহেন সাধুকে সঙ্গী পাওয়া বদ্রীপুরীতে খুব ভাগ্যের কথা।

যেতে আসতে লাগবে চারপাঁচ দিন। ও-পথে জনমানব তো দূরের কথা একটু গাছ গাছালী কি ছ' একটা পাখীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। খাবার নিতে হবে সঙ্গে। ষ্টোভ চাই একটা। আমাদের টেন্‌টের দরকার নেই। গুহা আর কিছুটা নিচের পাহাড়ে মেষ পালকদের খুপরীতে রাত কাটাব আমরা। অবধূত মহারাজ তাই বলে দিলেন।

আটা চা চিনি আর শুকনো ফলের সঙ্গে বেশি করে ঘি আর প্যাঁজ কিনে নিলাম। ঘি প্যাজে শরীর গরম রাখে। হিমাঞ্চল তীর্থভূমিতে পাহাড়ী প্যাঁজ সাধুদেরও তাই সুখাদ্য।

রওনা হতে হতে চারটা বেজে গেলো। অবধূত মহাবাজের সঙ্গে আরো তুজন সন্ন্যাসী যোগ দিলেন। মাল বইবার জন্য ধনসিংহও আমাদের সঙ্গে এলো।

যাত্রা সুরু হলো। সবার হাতেই একটি করে লাঠি। নগ্ন অবধূত মহারাজ সামনে। কোমরে একটা দড়িবাঁধা কৌপীন মাত্র। অপর সন্ন্যাসী তুজনেব পরণেও শুধু কৌপীন আর গায়ে কম্বল। আমাদের আহার সামগ্রী আর কম্বলাদি ধনসিংহের মাথায়।

বদ্রীনাথের ছ' মাইল রাস্তা সোজা। তারপরই পাহাড়ী পথের চড়াই। ডাণ্ডী বা ঘোড়া কিছুই যেতে পারে না এ-পথে। একমাত্র পা'ই সম্বল। পাহাড়ী ভাষায় এ-রাস্তাকে বলে 'পাগঁদণ্ডি'।

অবধূত মহারাজ আগে আগে। লোকেরা বলে পাহাড়ী পথে তিনি নাকি চলেন হরিণের মত হালকা কদমে।

কৈলাসানন্দ ও মোহনদাসকেও আগেই চিনতাম। ভজনের বৈঠকে পরিচয় হয়েছিল। কৈলাসনন্দ হৃষ্টপুষ্ট পাহাড়ী ছাঁচে গড়া। কুমায়ুঁতে বাড়ি ছিল। বয়স ত্রিশও পার হয় নি। মোহনদাস হালকা তুর্বল। দেখতে বাঙ্গালীর মত। এখনো একেবারে যেন ছেলেমানুষ।

বয়সও হয়তো সাতাশের সীমানা পার হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে মাথাভরে লম্বা জটা তৈরী করে ফেলেছে মোহনদাস।

ওদের দুজনেতে বেশ ভাব। যেতে যেতে গল্প করি ওদের সঙ্গে। সন্ন্যাসের কথা তুলি। কৈলাসানন্দের সংকোচ নেই। কিন্তু মোহনদাসকে খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করতে হয়। খুব তরুণ সন্ন্যাসীরা এমনি। বাড়ির কারো নাম বলবে না, দেশের নাম করবে না। বলে, ওসব বলে আর লাভ কি। শুধু মায়া বাড়ান। সন্ন্যাসীদের মধ্যে বড়দের কিন্তু এসব বলতে তেমন দ্বিধা নেই।

কৈলাসানন্দ ঘর ছেড়েছে বিয়াল্লিশের পরে। আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলো। জেলে বসে বসে শুধু জপ তপ করতো। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আর ঘরে ফেরেনি।

কৈলাসানন্দের চোখ মুখে এরই মধ্যে একটা শান্ত নির্লিপ্ততার ভাব গড়ে উঠেছে।

সন্ন্যাস নিলেন কেন? কৌতুহল দমন করতে পারলাম না প্রশ্ন না করে।

সাধু হবো কোনদিন ভাবিনি সে-কথা। কিন্তু ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়ায় আমরা মন বসতো না। লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারতাম না। বাড়িতে বাইবের কেউ এলে আমি অন্য দোর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। কে যেন নিজের অজান্তেই টেনে এনেছে আমাকে এই পথে।

সাধাসিধে কথা। জন্মজন্মান্তরের বিশ্বাস দিয়ে কৈলাসানন্দ ব্যাখ্যা করে তার সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ।

আর আপনি?

মোহনদাসের সংকোচ কাটে না। শুধু এইটুকু জানা গেলো যে মাত্র বছর চারেক আগে সন্ন্যাস নিয়েছে। কিছুকাল কলেজেও পড়াশুনা করেছে। বাড়ি আসামে।

প্রশ্নের উত্তর দেয় না বটে মোহনদাস, কিন্তু না দিয়েও পারবে না। পথের ঘনিষ্ঠতাই ওর মুখ খুলে দেবে। ওর চোখেমুখে এখনো যে ছেলেমানুষীর ছোপ লেগে রয়েছে! ওকি কথা না বলে পারবে!

রাস্তা মোড় নিলো। সরস্বতীর মোহনাকে পিছে ফেলে অলকনন্দা এগিয়ে চললো নিজের উৎসের দিকে। রাস্তা বলে এখন আর কিছু নেই। অলকনন্দার পাব বেয়ে এগুতে হয়।

বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু খুব মুষলধারে নয়। লাঠি ঠোকা দিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলছি আমরা অবধূত মহারাজের পিছে পিছে।

বাদলছাওয়া পথে অলকনন্দাকে অদ্ভুত রহস্যময়ী মনে হতে লাগলো। তুরন্ত স্রোতের অস্পষ্ট ঝিলিমিলি। মাঝে মাঝে অলকনন্দার কুলে ভাসা ববফেব চাপ। কোথাও হিমস্তর একেবারে পাহাড়ের শিখর থেকে অলকনন্দার পার পর্যন্ত নেমে এসে গড়িয়ে পড়ে আছে।

পথটা যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি পিচ্ছিল। সন্ধ্যার ছায়া ও বাদলের কুয়াসায় পথের অস্পষ্টতাও ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। এরই মধ্যে আবার চড়াই উৎরাইয়েরও অন্ত নেই। এই ওঠো। একটু নামো। আবার ওঠো। সারাটা পথটাই এমনি ঊর্দ্ধোন্মুখী।

অবধূত মহারাজ ফিরে আসছেন না!

এতক্ষণ পর্যন্ত অবধূত মহারাজ ছিলেন সবাব আগে। লম্বা দোহারা গড়ন। ক্ষীণ কটিতে একটুমাত্র কৌপীন। কাঁধের দুপাশ দিয়ে বড় বড় চুল ছড়িয়ে পড়েছে। লাঠি হাতে নগ্ন অবধূত মহারাজকে দূব থেকে যেন অশরীরী ছায়ার মত দেখাচ্ছিল। সেই ছায়া মূর্তিটি যেন পিছন ফিরে এলো।

দেখি সামনেই অলকনন্দার একটা অংশ একেবারে কঠিন বরফে

জমে রয়েছে। নদীর এপার ওপার ছুঁয়ে বরফের চাপ। বরফের তলা থেকে শুধু কলকল শব্দ শোনা যায়।

যে পথে যাওয়ায় কথা বরফ আর স্তূপীকৃত ভাঙ্গা পাথরে তার সবটাই বন্ধ হয়ে গেছে। দিনের আলোতে হলে অলকনন্দার বরফের উপর দিয়েই হেটে গিয়ে ধসের স্তূপটা পার হওয়া যেতো। কিন্তু এখন যে গোধূলীও আব বাকী নেই।

অবধূত মহারাজ কিছুটা পিছে ফিরে এসে উপরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন: অ্যাসা চলো!

কথাটা শুনে আমরা সবাই যেন একটু চকিত হলাম। সামনে ধসের স্তূপ। পাশে বরফ ঢাকা অলকনন্দা। আর যেদিকে অবধূত মহারাজ আঙ্গুল দেখালেন সেদিকে পথের কোনো চিহ্নও নেই। শুধু দেখা যায় একটা খাড়া পর্বতের বিরাট চড়াই আর বিক্ষিপ্ত শিলাপিণ্ড। মাঝে মাঝে কিছু ঘাস পাতা আছে।

কেমন যেন একটা ভয় হলো। আবার সবটা মিলে চলার পথটা রোমান্টিকও হয়ে উঠলো। বুক টিপ টিপ করছে। তবু চললাম অবধূত মহারাজের পিছে পিছে।

এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছেন অবধূত মহারাজ। আব ফিরে ফিরে তাকিয়ে ডাকছেন সবাইকে। আও! আও! ইধার আও! দেখো, ক্যাসা দেওলোক মেঁ চড় রহে হো!

উৎসাহের উত্তাপ পেয়েও এগুতে পারছি না আমরা। একে অন্ধকার। তার উপরে আবার পথের কোনো বালাইও নেই এরই মধ্যে বেচারা ধনসিং অতবড় একটা বোঝা পিঠে নিয়েও আমার পাশে পাশে চলছে। একটা পাথর থেকে আরেকটা উঁচু পাথরে উঠবার সময় ঠেলে দিচ্ছে পেছন থেকে।

লাঠি ভর করে, হামাগুড়ি দিয়ে, ঘাসের গোছা ধরে, কোনমতে

ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ আর দুটো বড় ঝরনা হয়ে উঠলাম গিয়ে একটা পর্বতের মাথায়। কিছুটা সম ভূমি পাওয়া গেলো সামনে। অবধূত মহারাজ ও কৈলাসানন্দ এগিয়ে গেছেন। মোহনদাস, সারথী ও আমি পিছনে। ধনসিংহও সঙ্গে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সবাই যে একটা কথাও বেরোয় না কারো মুখ দিয়ে।

হঠাৎ শুনি অবধূত মহারাজের মুখে খুশির আওয়াজ। একটা লতাপাতা ছাওয়া খুপরীর মুখে দাঁড়িয়ে ডাকছেন তিনি সবাইকে।

এতক্ষণে বোঝা গেলো অবধূত মহারাজের তাড়া দেবার কারণ। যে পথে গেলে গুহা পাওয়ার কথা ছিল সে পথটা বন্ধ থাকায় কোথায় যে এই প্রচণ্ড হিমেল রাতে আশ্রয় পাওয়া যাবে তাই নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন অবধূত মহারাজ। এখানে তাই একটা মেষ-চালকের খুপরী পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছেন তিনি।

ছোট একটা খুপরীতে অতিকষ্টে ঢুকলাম গিয়ে ছ'জনে।

স্টোভে চা আর হালুয়া পাকানো শুরু হলো। আর শুরু হলো অবধূত মহারাজের গল্প। এমনিতে তিনি স্বল্পভাষী। কিন্তু আজ যেন সবার সমবয়সী হয়ে উঠলেন। গল্প আর হাসি যেন লেগেই আছে অবধূত মহারাজের মুখে।

আরে তুম সব তো আজ দেওতা বন্ গয়ে! লকষ্মী বন মেঁ রাত বিতানা!—মহারাজের চোখে-মুখে সকৌতুক হাসি।

জায়গাটার নাম লক্ষ্মীবন। বদ্রী-অঞ্চলের পর্বতে কোনো গাছপালা নেই। চারিদিকটাই একেবারে নগ্ন নিরেট। কিন্তু এ-পর্বতটি শ্যামল গাছপাতায় পরিপূর্ণ। ঘাসপাতা ও বড় বড় ভোজপাতার গাছে চারিদিক ভরা। তাই এই জায়গাটির নাম হয়েছে লক্ষ্মীবন।

পাথরের উপরে পাতা-লতা বিছিয়ে ওরই উপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম ছ'জনে। মেষপালের নিত্যকর্মের প্রসাদে সারা খুপরী পরিপূর্ণ। তারই মধ্যে ঘুমের পাট শুরু হলো। সবাই এক একটি শম্বুকাসন করে হাত-পা গুটিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হলাম।

ভোরে উঠে দেখি সত্যি লক্ষ্মীবন। চারিদিকে অজস্র ফুল ফুটে আছে। লতাপাতায় ঘেরা ব.। দূরে ভোজপাতার অনেক গাছ। সামনে অলকনন্দার ওপারে দেখা যায় বসুধারা। পাহাড়ের সুউচ্চ শিখর থেকে তির্যক রেখায় বসুধারার জলস্রোত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে এসে অলকনন্দার বুকে। তারই বারিপাতের প্রচণ্ড শব্দ। বসুধারার দুপাশে আরো দুটি ছোট ঝরনা। বসুদেব নাকি এখানে তপস্যা করেছিলেন। তাই এ-ঝরনার নাম হয়েছে বসুধারা। কেশবপ্রয়াগ থেকে মাইল দুই এগিয়ে গেলে দূব থেকেই বসুধারা দেখা যায়। বদ্রী-যাত্রীদের কাছে বসুধাবা তাই একটি বিশেষ আকর্ষণ।

চারিদিকের পাহাড়ে নরম রোদ উঠেছে। সব দিকেই বরফ। কোথাও জমানো। কোথাও গড়ানো। পতনোন্মুখ হয়ে রয়েছে কোথাও। পর্বতের শিখর থেকে উচ্চতর পর্বত-শিখর দেখার এ যেন এক নূতন দৃষ্টি! তুষারের জটা ছড়িয়ে পর্বতগুলি যেন সবাই একযোগে ধ্যানাসনে বসেছে।

অনেকখানি নেমে এসে আমরা বসলাম গিয়ে এক ঝরনার পাশে। চা খাওয়া হবে ঝরনার জল ফুটিয়ে।

এমন জায়গায় চা! সারা জীবনে স্মৃতির অমৃত হয়ে কতবার এ-পানীয় যে পুনরাস্বাদনের আনন্দ দেবে!

পাশেই অলকনন্দার উৎস। গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ারের পূবমুখ।

এই গ্লেশিয়ারের নামই অলকাপুরী। কথাটা শুনতেই যেন কেমন রোমাঞ্চ লাগলো। এই সেই অলকাপুরী! ভারতের কত কাব্য কত কাহিনীর অবিস্মৃত স্বপ্নপুরী! কত অমর কবির মানস-রাঙানো এই তুষার-মণ্ডিত দেবাঞ্চল! কল্পনা যেন সত্যি এখানে বাস্তব হয়ে উঠেছে। যেমন করে অস্পষ্ট বাষ্প রোদের স্পর্শে সুকান্ত হয়ে ওঠে রামধনুতে। সৌন্দর্য যেন সত্যি এখানে স্বপ্নায়িত হয়ে উঠেছে অলকনন্দার এই অপূর্ব উৎসটিতে।

আবেশ মাখা চোখে চেয়ে রইলাম। হিমাবৃত্ত একটি উত্তুঙ্গ গিরিশিখর। তারই দুপাশে অপেক্ষাকৃত উঁচু আরো দুটি তুষার-কিরীট। তিনটি শৃঙ্গই দাঁড়িয়ে আছে যেন একটি সিংহ-দুয়ার রচনা করে। যেন এই রাজতোরণ পার হয়ে তবে যেতে হয় অলকাপুরী। শিখর তিনটির পিছনে দেখা যায় অলকাপুরীর পথ। সুবিস্তীর্ণ একটি হিম-সমতল। অনেকখানি প্রশস্ত। সামনের দিকে বহুদূর অবধি বিলম্বিত। সুউচ্চ সমতলের সবটাই কঠিনভাবে হিমাবৃত। এই তুষার ভূমিটির নামই অলকাপুরী। যোজনের পর যোজনব্যাপী এর অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃতি। সবটাই শ্বেত-শুভ্র। যেন নির্মুক্ত দেবাত্মাদের নিত্য বিহারের জন্য নির্মিত এক তুষার-ছাওয়া দেবাঙ্গন।

ভাগীরথী এই হিমচাপের পশ্চিম মুখ থেকে উৎসারিতা। আর পূব থেকে অলকনন্দা। একই অলকাপুরীর দুমুখের বার্তা বয়ে শঙ্কর সোহাগিনীরা আবার গিয়ে দু'জনে মিলিত হয়েছেন দেব-প্রয়াগে।

অলকাপুরীর নন্দন-বাণী বয়ে আনছে বলে এই স্রোতস্বতীর নাম হয়েছে অলকনন্দা। প্রভাতী রোদে দেখা যায় অলকনন্দার অজস্র ধারা। অলকারাণী যেন চুলের গুচ্ছ বিছিয়ে দিয়েছেন সোনালী রোদে। আঁকাবাঁকা ও অবিন্যস্ত গুচ্ছ গুচ্ছ জলের

ধারা। উচ্ছল ও অনুরুদ্ধ গতি। কঠিন চাপে তার বড় বড় শিলাপিণ্ডগুলি ভেঙ্গে-চুরে বিচ্ছিন্ন হয়ে অজস্র উপলখণ্ডে ছড়িয়ে আছে চারিধারে। সোনালী রোদে তুষার-গলা অলকনন্দার এই শতধারার উৎসটি তীর্থযাত্রার এক অপূর্ব-দর্শন!

শিলাসনে বসে সবাই চা খাচ্ছি। এমনি সময় শ্রীবাঙ্গালী মহাশয়ও তাঁর ছ'জন কুলী সমভিব্যহারে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রওনা হয়েছিলেন খুব ভোরে আর আমরা প্রায় বিকেলে।

বোধ হয় বিস্ময় ও লজ্জা দুটোই মাখামাখি করে গেলো তার চোখে-মুখে। লোকটা তবুও এলো! আর এলো অবধূত মহারাজকে নিয়ে! কথাটা নিশ্চয়ই খোঁচা দিয়ে গেলো ওর সংকুচিত মনকে।

চা খাইয়ে দিলাম শ্রীবাঙ্গালী মহাশয়কে। তারপরেই অবধূত মহারাজের পিছনে পিছনে আবার ছুট। ছ'কুলীর সওয়ারী পড়ে রইলো আরো পিছনে। শিলা-হরিণ অবধূতের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখা তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

কিছুদূর এগুতেই চোখে পড়লো একটি ত্রিকোণ পথ। পথ ঠিক নয়,—একটা গিরিমালার দুপাশে দুটি সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা।

এক পাশে নারায়ণ পর্বত। অন্যপাশে অলকাপুরী। আর সামনে অজানা আর একটি পর্বতশ্রেণী। তিনটি গিরিমালা এসে মিলিত হয়েছে এই ত্রিকোণ পথটিতে।

এই ত্রিকোণ সঙ্গমটি এক ভয়াল-সুন্দর দৃশ্য। একদিকে দেখা যায় নারায়ণ পর্বতের শিখর থেকে ঝরে পড়ছে সহস্রধারা। অর্থাৎ নারায়ণ পর্বতের পশ্চিম পার থেকে উৎসারিত অগণিত ঝরনা ধারা। এই সহস্র ঝরনার জল একে একে সম্মিলিত হয়ে একটি ক্ষীণতোয়া তটিনীর আকারে বয়ে আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ধরে। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে আসছে ভাগীরথীর

আরেকটি শাখা। এই জলপ্রবাহ দুটি মিলিত হয়েছে এসে অলকনন্দায়।

যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই বরফ। আর বিস্তীর্ণ শিলাখণ্ড। সমস্ত পর্বতের শিখরেই তুষার কিরীট। গায়ে হিমাবরণ। রোদের ছটায় এ তুষার-নগরের দিকে ভাল করে চাওয়া যায় না। চোখ ঝলসে যায় আলোর প্রতিফলনে।

ভাগীরথীর শাখা যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকটিতে বহু যোজনব্যাপী একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। তারই মধ্যে ভাগীরথীর শাখাটি প্রবাহিতা। এই উপত্যকাটিতে জলধারা বিশেষ চোখে পড়ে না। শুধু দেখা যায় রাশি রাশি শিলা-খণ্ড এবং স্তূপীকৃত বরফেব ঢেউ। মনে হয় হাজার হাতিতে লাঙ্গল জুড়ে দিয়ে এইমাত্র কেউ এসে যেন সমস্ত উপত্যকাটিকে চষে দিয়ে গেছে। আব তারই আলে আলে প্রবাহিত হচ্ছে ভাগীরথীর পূর্বমুখী শাখাটি।

এখান থেকে যা দেখা যায় তা একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর ও অপূর্ব সুন্দর।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঢুকলাম আমরা। এপথে এগুনো কঠিন। এখানে পথ মানে বিধ্বস্ত শিলাখণ্ড আর বিচ্যুত হিমস্তব। বরফের উপর দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলতে হয়। ববফও খুব পিচ্ছিল। সামনেই সহস্রধারার নদীটি।

স্রোতও খুব। হেঁটেই পার হওয়া যায় তবু। কিন্তু বরফ-গলা জল যা ঠাণ্ডা!

নদীটি পার হয়েই যাত্রা শুরু হলো সত্পন্থের দিকে।

বাঁ পাশে নারায়ণ পর্বতের শিখর থেকে উৎসারিত সহস্র-ধারার ঝরনাগুলি খুব স্পষ্ট দেখা যায়। যেন অগণিত ঝরনার এক মহাসম্মেলন বসেছে নারায়ণ পর্বতের শিখরাঙ্গনে।

অবিশ্রান্ত ও অবিচ্ছিন্ন বারিপাতের শব্দ। শুনতে শুনতে আর আর শোনা যায় না। এমনি তার একটানা লয়।

সহস্র ধারার সমস্ত জলরাশি মিলে গড়ে তুলেছে একটি নদী। যেটি শাখা-ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে সম্মিলিত হয়েছে গিয়ে অলকনন্দায়।

ডান পাশে পাথর আর বরফ ধ্বংসের আরেকটা বিস্তীর্ণ প্রসার। কত মাইল হবে বলা যায় না। এরই পশ্চিম প্রান্তে খাড়া হয়ে আছে একটি হিমাবৃত্ত পর্বতশ্রেণী। অনেকটা নারায়ণ পর্বতের সমান্তরাল।

চলার কোনো পথ নেই। সহস্রধারার নদীর পাশে উটের পিঠের মত একটা নিচু পাহাড়। একটানা পড়ে আছে কয় মাইলব্যাপী। এই ভাঙ্গা পাহাড়টিব মাথাই রাস্তার দিশারী। এবং এটাই সত্‌পন্থের পথ।

পথ-চিহ্ন না থাকলেও পথের নিশানা আমাদের সামনেই আছে। যেন উড়ে উড়ে চলছেন অবধূত মহারাজ। কিছুদূর যান আর কোনো উচু পাথবের উপরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়েন আমাদের দিকে। চারিদিকের কুয়াসাব মধ্যে ওই হাতছানির টানে আমরাও এগিয়ে চলি তাঁর পিছে পিছে।

এমনি উঁচু পথে দম নিতে কষ্ট হয় বটে কিন্তু বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে যেন ঠাণ্ডা মনে হয় না। চলতে চলতে গা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে হয় রাক্ষসের মত হা হা করে।

চক্রতীর্থে এসে পৌছলাম প্রায় বিকেলে। কত মাইল এলাম জানি না। মাইল গোণার কোনো চিহ্ন নেই এ-পথে। তবে অবধূত মহারাজের টানে টানে এসেছি অনেক মাইল।

প্রকৃতির একান্ত পাদপীঠে রচিত এই চক্রতীর্থ। একটি জনপ্রাণীও নেই। ইট-পাথরের মন্দিরও নেই কোনো। পর্বতের

চক্রাকারে আবেষ্টিত পলিমাটি ভরা একটুকু সমতল ভূমি। তৃণ পুষ্পে শ্যামল। গাছ নেই কোনো। শুধু দূর্বাদলের কচি পাতায় সমস্ত স্থানটুকু ছাঁওয়া। এরই মাঝে ক্ষীণ ও শান্ত জলের ধারা। চারিপাশটায় রুক্ষ কঠিন পর্বতের প্রাচীর। এই চক্রায়িত শ্যামল ভূমিটুকু আর মাথার গোলাকার আকাশের একটু নীলাভা ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না চক্রতীর্থ থেকে।

নারায়ণের চক্র নাকি কবে এসে পড়েছিল এখানে। তাই থেকে নাম হয়েছে চক্রতীর্থ।

সমতল মাটিতে বড় বড় কয়টি শিলাখণ্ড কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তারই কয়েকটির তলা গুহার মত। উপরে নীচে চারিদিকে এবড়োথেবড়ো পাথর। মাঝে কিছুটা সুড়ঙ্গের মত জায়গা। এরই নাম চক্রতীর্থের গুহা। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় এর ভিতরে।

একটু বিশ্রাম করেই শুরু হলো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। খাওয়া তো নয় যেন এক অপূর্ব বনভোজন। এমনি জায়গায় ভোজন না হলে কি আর বনভোজন! অবশ্যি একে বনভোজন না বলে শিলাভোজন বললেই মানায় ভাল। কারণ, আশে-পাশে কোনো বনের নাম-গন্ধও নেই। আছে শুধু অগণিত শিলাখণ্ড।

দূরের স্রোতা থেকে জল আনা হলো। শুকনো তৃণ-গুল্ম কুড়োতে গেলেন সবাই। এ-জ্বালানী দিয়েই রান্না হবে।

অ্যাসা নঁহী। আওর বহুত। অবধূত মহারাজ ঘাস কুড়োতে কুড়োতে বললেন আমাদের।

সাধুরা সবাই দেখি বোঝা বোঝা ঘাস-পাতা নিয়ে আসছে।

এত জ্বালানী দিয়ে যে কি হবে বুঝলাম না। তবুও অনেকগুলি ঘাস এনে জড় করে রাখলাম। অবধূত মহারাজের আদেশ।

এব মধ্যে কৈলাসানন্দ মোহনদাসও আলখাল্লা ছেড়ে ফেলে কৌপিনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। কৌপীন-কটি তিন নগ্ন সাধু লেগে গেলেন রান্নায়। সে এক দৃশ্য বটে! সন্ন্যাসীদেব বান্না কি যে পরমামৃত হবে ভগবানই জানেন!

মরিচ দিয়ে কটা কটা কবে আলুব ঝোল বাঁধা হলো। ঝালে নাকি শীত কমায। ভাতও নামলো। কিন্তু আধফোটা। এজন্য অবশ্যি সাধুবা দাযী নন। কাবণ অত উঁচুতে ভাল কবে জল ফোটান যায না।

রান্না তো হলো। খাব কিসে কবে? আনাব মধ্যে তো একটি কেট্‌লী, একটি পেতলেব ডেকচি আব তুটো কবে গ্লাস ও বাটি।

এবাব উপায়টা বাত্‌লে দিলো কৈলাসানন্দ। একটা পাথব এনে জল দিযে ভাল কবে ধুযে নিলো। চিতনা দিকটা তাব পেতে নিযে খেতে বসে গেলো। পাথরই হলো শিলা-ভোজনের শিলা-পাত্র। আমরাও তাই দেখে একটি করে শিলাপাত্র নিয়ে তাব উপরেই ভাত বেখে খেয়ে উঠলাম।

তুটো গুহায ভাগ হয়ে গেলাম আমবা। সাধুবা গেলেন একটা আলাদা গুহায। বাতে জপ তপ আছে তাদের। আর সাবথী ও আমি বইলাম আবেকটিতে।

কিন্তু শুই বা কি কবে? অসমতল পাথবের তীক্ষ্ণ কোণগুলিতে যে অবিবাম পিট ফুটবে! তাই নয় শুধু,রাতেব তীব্র ঠাণ্ডায় পিঠেব হাড়গোডও জমিয়ে দেবে। এবাব বুঝলাম কেন এত ঘাসপাতা সংগ্রহ করা। এই ঘাসপাতাই হলো আমাদেব শিলাশয্যার গদী। পাথবের খোঁচা থেকে পিট বাঁচবে, ঠাণ্ডাও লাগবে কম। ছোট্ট গুহার মধ্যে পিঠ বাঁকিযে শুযেও তাই কষ্ট হলো না তেমন।

ভোর হতে না হতেই মোহনদাস ডেকে গেলো: উঠুন, উঠুন! পুষ্পশয্যা ছেড়ে উঠুন! চা তৈবী।

লজ্জা পেয়ে গেলাম। সাধুরা আগেই উঠে গেছেন।

সাধুদের সেবা করে গৃহীরা, আর আমরাই সাধু-সেবা নিচ্ছি। তীর্থ ধর্মতো গেলোই, আরো কিছু পাপ দিয়ে দিলেন আমাদের মহারাজ আপনারা : হাসতে হাসতে বল্‌লাম সহযাত্রী সাধুদের।

আরে অজী গির্‌হী! ভলা, তো অব ঘর কাঁহা? অব তো তুম্‌ সব ধরতী কা নাংগা লাল বন গয়ে। কোন্‌ সাধু আউর কোন্‌ গিরহী!

খুতখুতিটাকে যেন হাই তোলার মত উড়িয়ে দিলেন অবধূত মহারাজ। সাত ভোরেই রওনা হয়ে পড়লাম সত্‌পন্থের দিকে। স্টোভ আর চা ছাড়া আর সব পড়ে রইলো চক্রতীর্থের গুহায়। বাকি কম্বলগুলি পর্যন্ত। শুধু একটা করে কম্বল জড়িয়ে নিলাম যার যার গায়ে।

সত্‌পন্থ্‌ থেকে বিকেলেই ফিরবো। রাতে থাকবো এসে চক্রতীর্থে। সত্‌পন্থে অসম্ভব শীত। তাই এরূপ ব্যবস্থা হলো।

চক্রতীর্থের সমতল থেকে আবার শুরু হলো উপরে ওঠা। উপবে উঠে একটু দম নিতে নিতে মহারাজকে বলি : অত ছোট গুহায় তিনজনে কাল শুলেন কি করে?

নিন্দ্‌কী দেবী আপনি পূজা খুদহী লে সাকতি। সুঁই কে মুহ্‌ সে ভী আপনা পাট বিছা সাকতি।...

মনে হলো যেন উত্তবটা এড়িয়ে গেলেন।

সত্‌পন্থ আগে। কিন্তু রাস্তার কোনো নিশানা নেই। পাহাড়ী চিহ্নও নেই এতটুকু। সামনের সবটাই যেন খ্যাপা সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মত চারিদিকে বিক্ষুব্ধ হয়ে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় ভাঙ্গা ভাঙ্গা শিলারাশি আর জমানো বরফ। দুইই সমান ভাবে কঠিন। শিলা ও বরফের খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভে চারিদিক ঘিরে যেন এক চরম অরাজকতা। শুধু উপরেই নয় পাথরের নীচেও জমাট বরফ।

কোথাও তলার বরফ ফেটে আবার হা করে রয়েছে। মাঝখানে বরফ গলে কোথাও ছোট ছোট খাল হয়ে আছে। আবার কোথাও বড় বড় পাথরের ফাঁকে এক একটা বরফের চাপ চৌচির হয়ে যেন এক একটা অতলান্ত গহ্বর বানিয়ে রেখেছে। •

বরফে পাথরে মাটিতে মিশে এক এক স্থানে এমন হয়ে রয়েছে যে বিবর্ণ খণ্ডগুলির কোন্‌টা পাথর আর কোন্‌টা বরফ তা'ও বোঝা যায় না। একটু খেয়াল করলেই পাথর ও বরফের তলায় জলের কলকল ধ্বনি শোনা যায়। যদি সমস্তটাই বরফে পাথরে জমে গিয়ে একটানা একটা স্তূপ হয়ে থাকতো তাহলে আশঙ্কার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু কোন্ পাথরটা বা কোন্ বরফের চাপটি যে কখন হুড়মুড় করে কাৎ হয়ে পড়ে যাবে বা কোন্‌টা যে ধসে গিয়ে কোন্ গহ্বরে ঢুকে পড়বে তার কিছুই ঠিক নেই। চারিদিকে অবিরল শুধু বরফ আর পাথর-বিচ্যুতির শব্দ। ধুপ ধাপ······ ধুস্ ধাস্···ঘব ঘরাৎ···ধুম্। যেন বরফ পতনের এক জলসা বসেছে সত্‌পন্থের পথে।

এ রাস্তাটা সত্যি ভয়ঙ্কর। পদে পদে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পিছলে পড়ে গেলে এ-খাদে বা ও-খাদে হিমসমাধি হবার সম্ভাবনা তো আছেই, তা ছাড়া কোন্ পাথরের উপর কখন চাপবো আর অমনি সেটা সওয়ারীকে নিয়ে ঢুকবে গিয়ে পাতালপুরীতে তারও কোনো ঠিক নেই। এখানে দুর্ঘটনা মানেই ঘটনার যবনিকা।

সারথীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু। মোহনদাসেরও এই সত্‌পন্থে প্রথম আসা। বেচারার মুখেও আর শব্দটি নেই।

তবুও যাত্রাটা যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণীয়। ভয় আর বিস্ময়ের কোলাকুলীতে বারবার দোলা খেয়েও ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত না হয়ে উপায় নেই।

ভয়ে ভয়ে অতি সাবধান হতে গেলে অসাবধানতা যেন আরও বেড়ে যায়। অবধূত মহারাজ তাই এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হালকা কথার খোঁচায় পথের শঙ্কা হাল্‌কা করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

আরে ও বাহাদুর যাত্রী! চল্‌তা কাঁহা! অ্যাসা খতরনাক রাস্তা তো কই ভী তীর্থ যাত্রা মেঁ মিলতা নহীঁ।

চলতে চলতে বলেন: কৈলাস যাও, মানস যাও, কোথাও রাস্তা এমন খারাপ নয়। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর রাস্তাও না। হিমালয়ের কোনো তীর্থেই রাস্তা এমন বিপদ সঙ্কুল পাবে না।

অবধূত মহারাজ ও কৈলাসানন্দ বারকয়েক কৈলাস-মানস এবং গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে এসেছেন। হিমাঞ্চল তীর্থের সব তাঁদের জানা।

এবার কিন্তু অবধূত মহারাজ বা কৈলাসানন্দ আর দূরে দূরে নয়। হাত ধরে ধরে আমাদের এক পাথরের স্তূপ থেকে আরেক পাথরের স্তূপে পার করে দিচ্ছেন। আবার নিজেরা আগে যেয়ে পরীক্ষা করে তবে বলে দিচ্ছেন কোন্ পাথরটার পরে কোন্‌টায় পা ফেলতে হবে।

সত্‌পন্থের কাছাকাছি গিয়ে কয়টা খুব বড় ঝরনা পার হতে হয়। ঝরনাগুলি আসছে নারায়ণ পর্বতের পেছন দিককার শিখর থেকে। নিচের দিক থেকে ঝরনাগুলি পার হওয়া যায় না। স্রোত অত্যন্ত বেশি। উপরে ঝরনার ধারা সঙ্কীর্ণ এবং বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে প্রবাহিতা। তাই ঝরনাগুলি পার হওয়ার জন্য অনেক উপরে উঠে আবার নিচের দিকে নেমে আসতে হয়।

চক্রতীর্থ থেকে সত্‌পন্থ্ বেশী দূরে নয়। কয়েক মাইল মাত্র। তবুও খুব সন্তর্পণে পাথর ঠুকে ঠুকে এ-পথটা চলতে হয়। তাই অল্প রাস্তায়ও সময় লাগে অনেক বেশি।

সত্‌পন্থে পৌঁছে সবারই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো।

এতক্ষণ ভাল করে দেখতেও পারিনি চারিদিকটা। দৃষ্টি ছিল সব সময়ে পায়ের দিকে। এবার সত্‌পন্থে দাঁড়িয়ে দেখি চারিদিক ঘিরে প্রকৃতির এক ভয়ঙ্কর ও অতিকায় রূপায়ণ। প্রথম দর্শনে কেমন যেন একটা অজানা ভয় ও বিস্ময়ে সমস্ত দেহে শিহরণ লেগে যায়।

সত্‌পন্থ! সত্যলাভের পথ। কোনো মন্দির নেই। কৃত্রিমতার রেণু স্পর্শটুকুও নেই কোথাও। প্রকৃতিময় তীর্থভূমি। আবিস্তীর্ণ ধ্বংস লীলার মধ্যে একটি সুনীল বিন্দু মাত্র। টলটল করা একটি নীলমণি সরোবর। এই সত্‌পন্থ!

খুব বড় নয় ছোটও নয় সত্‌পন্থের হ্রদটি। চারিদিকে উঁচু পাহাড়ের আবেষ্টন। সরোবরের পাবে পারে বিক্ষিপ্ত শিলারাশি ও অগণিত উপলখণ্ড। একপাশে বিস্তীর্ণ একটি হিমস্তব সরোবরের জল ছুঁয়ে এলিয়ে আছে। সরোবরের জলরাশিতে কোনো চাঞ্চল্য নেই। স্থির নিস্পন্দ জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কিন্তু সুগভীর। সমস্ত নীলাকাশের বর্ণটি নিঙড়ে নিয়ে যেন টলটল করে ভাসছে সরোবরের জলে। একটি তৃণ কি একটি গুল্মও নেই জলের মধ্যে।

যাত্রীরা আসে এ-সরোবরে স্নান করতে। মৃতের অস্থি বিসর্জন দেয়। কাঞ্চন ও তাম্রখণ্ড নিক্ষেপ করে সরোববেব জলে। পাহাড়ী অঞ্চলে নারকেল এক অমূল্য ফল। তাই উৎসর্গ করে হ্রদের জলে। হাত জোড় করে মন্ত্রপাঠ করে নিজেরাই। পূজারতির আর কোনো আড়ম্বর নেই এই প্রকৃতিময় নির্জন তীর্থে।

কিন্তু এও বা কেন! এখানে প্রকৃতিই যে প্রতিমা। অনুভব-ই যে বিগ্রহ। কোনো প্রতীক নেই এখানে। মানব মনের সীমিত কল্পনার নেই কোনো আত্মরূপায়ণ। এ-তীর্থের দেবারতি শুধু অনুভূতি। অঞ্জলি,—শুধু অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা-তর্পণ।

বুঝি এই কথাটুকুই তীর্থকামীদের স্মরণ করিয়ে দেয় সত্‌পন্থ্‌। প্রতীক হলো পূব আকাশের প্রভাতী তারা, উদয়ভানুর স্মারনিক। বুঝি, বলে আনন্দ-সুন্দরের পরম অনুভূতি মিলে রূপ ও কল্পনার নির্মুক্তিতে! রূপ আর রুচির বিসর্জনে চিত্তে যবে ওঠে অপ্রাকৃত অনুরণন তবেই বুঝি ছোঁয়া লাগে প্রাকৃতের অমূর্ত স্পন্দন।

এজন্যেই কি অজানার সন্ধ্যানীরা ঘুরে ফিরে আশ্রয় খোঁজেন বনে পর্বতে নয়তো সাগর বেলায়।

প্রকৃতি সত্‌পন্থের চারিদিকে যেমন রুদ্র তেমনি ভয়ঙ্কর। কিন্তু অদ্ভুত আকর্ষণীয়। অলকাপুরীর পাদদেশ থেকে যে সুবিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়—একদিনে তা এমনি খণ্ডবিখণ্ডিত হয়নি। ডাইনে বায়ের পর্বত দুটি যে একদিন পারস্পরিক সংযোগে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত ছিল, চক্রতীর্থগামী তীক্ষ্ণ-মেরু অনুচ্চ পাহাড়ী পথটি তারই কঙ্কাল-স্বাক্ষর।

সত্‌পন্থে দাঁড়িয়ে বাঁধানো পটের মত দেখা যায় প্রকৃতির এই ভয়াল-মধুর রূপটি। দুপাশের তুষার-মণ্ডিত উত্তুঙ্গ গিরিশিখর থেকে হিমস্তর এলিয়ে আছে চারিদিকে। অবিরত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে এই হিমস্তর। উপর থেকে নেমে আসা বিচ্যুত বরফের চাপে চাপে ভেঙ্গে পড়ছে আরও শিখরাঙ্গ। চারিদিক ঘিরেই যেন ভাঙ্গনের এক অবিচ্ছিন্ন রোল। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে অবিরাম ছড়িয়ে পড়ছে ভীমকায় শিলারাশি আর বরফের প্রচণ্ড স্তূপ। ক্ষণে ক্ষণে যেন বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড গর্জনে শঙ্কিত করে তুলছে যাত্রীদের মন। পাথরের গায়ে ঘাতপ্রতিঘাতে এই শিলা পতনের ধ্বনি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে সত্‌পন্থের দিগাঙ্গনে। মনে হবে যেন সত্‌পন্থের পার্বত্য গগনে বজ্রগর্জনের কোনো ক্ষান্তি নেই। যুগের পর যুগ ধরে এমনি চলছে শিলা মন্থনের পালা।

তুষার জমছে, পাথর ভাঙ্গছে। এমনি চলছে শিলা মন্থনের অপূর্ব জল-কেলী। দেখে মনে হবে মাত্র কিছুক্ষণ আগে বুঝি ঘটে গেলো শিলা মন্থনের এই ভয়ঙ্কর লীলা।

শিলা ধ্বংসের বিস্তীর্ণ প্রবাহিকা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তারই মাথায় স্থির হয়ে আছে একটি অতিকায় হিমস্তর। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন সামনেব দিকে সুবিস্তীর্ণ উর্দ্ধগামী একটি রাজপথ। বিসর্পিল গতিতে এগিয়ে গিয়ে মিশে গেছে এক তুষার মণ্ডিত উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীব অভ্যন্তবে। কোথাও আঁকানো-বাঁকানো, কোথাও ডাইনে-বায়ে দোলায়িত। এই হিমাদ্রি পথটিই মহাভারতের স্বর্গ-সরণীর কল্পনা। পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণের ঐতিহাসিক পথ। এই স্বর্গদ্বার!

পাণ্ডবেরা কেদারনাথেও যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু সত্‌পন্থের পথেই আরোহণ করেছিলেন স্বর্গ-সবণীতে। পুবাণবিশ্বাসীদেব এই অভিমত। সত্‌পন্থেব সবোবরে স্নান কবে দ্রৌপদীসহ এপথেই পঞ্চপাণ্ডব এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্গারোহণে।

বাদল ঘেরা অস্ফুট আলোয় এই অপূর্ব-সুন্দব হিমস্তরটির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম,—এই কী স্বর্গারোহণ। সত্যি কি এই স্বর্গের পথ! কোথায় স্বর্গ? সামনে তো শুধু দীর্ঘায়িত একটি সুবিশাল হিমস্তর। মৃত্যুর মত কঠিন ও বর্ণহীন। ওখানে তো স্বর্গ নেই! পাণ্ডবেরা কি জানতেন না সে কথা? তবুও কেন তারা বেছে নিলেন স্বর্গ আরোহণের নামে হিমাস্তীর্ণ এই অতিকায় গিরিপথটি?

তারা চেয়েছিলেন দেহের অবসান এবং সেই নির্মম অবসানকে সুন্দর করে তুলবার জন্যই বুঝি বেছে নিয়েছিলেন এই ভয়ঙ্কর সুন্দর স্থানটি। কল্পনায় একেই সুমূর্ত করে তুলেছিলেন স্বর্গ

আরোহণের রাজপথ রূপে। প্রকৃতির যে অবদানে মানুষের জন্ম ও জীবন, তারই মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াতেই তো মৃত্যুর পরম মূল্য। স্বর্গারোহণের এই কল্পনায় পাণ্ডবেরা বুঝি মৃত্যুর মর্মান্তিকতাকেও অপরূপ সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলেন এই অপূর্ব হিমাদ্রি-যাত্রার নির্মম মাধুর্য্যে।

অবধূত মহারাজ স্তোত্র পাঠ করতে করতে স্নান সেরে ফেললেন। নগ্ন থাকেন, তাঁর আর ভয় কি। কৈলাশানন্দও ডুব দিয়ে উঠলো। ইতস্ততঃ করতে করতে মোহনদাসও।

আর আমরা? জল একটু ছুঁই আর হাত তুলে আনি। যেন তপ্ত কড়াইয়ে আঙ্গুল লেগে ছ্যাৎ করে ওঠে। এই বরফ-গলা জলে নামলে জলের মধ্যেই যে জমে যাব। জলেব দিকে চাই, তো দাঁতে দাঁতে যেন খিল লাগে।

অবধূত মহারাজ বললেন: সত্‌পন্থ্‌ মেঁ আস্নান নহী করোগে? নঁহী! নঁহী! দেখ লো ক্যাসা মজা আতা আস্নান কে বাদ।

মনে মনে ভাবি: হুঁ সাধু! তোমাদের আবার শীত-গরমের ভয়! জ্বর গায়ে নিয়ে পর্যন্ত অলকনন্দার বরফ-জলে স্নান করতে আটকায় না তোমাদের!

আরে! সারথীও যে ডুব দিয়ে উঠলো!

জয় বাবা! জয় বাবা সত্‌পন্থ্‌! ঝুপ ঝুপ করে তিনটে ডুব দিয়েই এক লাফে উঠে এলাম জলের তলার পাথর ছেড়ে।

তারপর শুরু হলো সত্‌পন্থ্‌ সরোবরের পরিক্রমা। সাধুরা গম্ভীর সুরে স্তোত্র আবৃত্তি করছেন আর প্রদক্ষিণ করছেন সরোবরটি।

প্রদক্ষিণ করে কি ফল হবে জানি না। অনেক কুণ্ড, অনেক মন্দিরই আমার প্রদক্ষিণ করা হয়নি। অন্ততঃ সরোবরের চারিদিকটা

তো ঘুরে দেখা যাবে। স্নানের পর শরীরটাও তো গরম হবে। আর এই নিবিড় পরিবেশে সাধুদেব সুরেলা ও সুগম্ভীর আবৃত্তি এত মিঠে লাগছিল! যেন তারই টানে সাধুদের পিছে পিছে এগিয়ে গিয়ে শেষ করে এলাম সত্‌পন্থের তীর্থ-পরিক্রমা।

কথা ছিল সত্‌পন্থ্ পরিক্রমার পরে হালুয়া এবং চা খাওয়া হবে এবং তারপরে দুপুরেই আবার রওনা হবো চক্রতীর্থের দিকে। সত্‌পন্থের হাড় কাঁপানো শীত এড়াবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দুপুর গড়াতেই রওনা হয়ে পড়লাম। বর্ষার দিনে সত্‌পন্থে সূর্যের মুখ দেখা যায় খুবই কম। বাদল আর ঘন কুয়াসায় চারি-দিক ঢাকা থাকে। কিছুক্ষণ আলো ছিল। কিন্তু দুপুর থেকেই কুয়াসা ও বাদল আবার গাঢ় হয়ে উঠতে লাগলো। একটু এগুই কি বিশ হাত দূরেও আর কাউকে দেখা যায় না।

এ-কঠিন পথটা এভাবে পার হবো কি করে? কিছুদূর এগিয়ে অবধূত মহারাজও থমকে দাঁড়ালেন। একটু হাঁটেন আর ইতস্ততঃ করেন। এ-রাজ্যে পথ হারালে যে নিরালা রাতে জমে জমে আরেক টুকরো পাথর হয়ে যেতে হবে।

দুপুর বিকেলের দিকে গড়াতে শুরু করলে বাদল যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠলো।

কিন্তু ফিরেই বা যাবো কোথায়? খাবার নেই। কম্বলও নেই! না খেলে এক রাতে এমন কিছু কষ্ট হবে না। কিন্তু সত্‌পন্থের শীত!

উভয় সংকটে পড়ে গেলেন অবধূত মহারাজ। এদিকে সেদিকে চেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে নিরাশ কণ্ঠে বললেন: সত্‌-পন্থেই ফিরে চলো। আজ রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে।

একটা গুহা খোঁজ করে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন সবাই। ও স্যাঁতসেঁতে দম আটকানো সুড়ঙ্গটির মধ্যে যেতে ইচ্ছে করছিল না তক্ষুনই। ওঠা যায় না, বসা যায় না। এদিকে বসি তো পাথরের খোঁচা। ওদিকে ঘুরি তো তাও একই দশা। রাত হোক। শীতই চাবুক মেরে ঢুকিয়ে দেবে গুহার মধ্যে।

বাদলের মধ্যেই সত্‌পন্থের পারে একটা উঁচু পাথরের উপরে গিয়ে বসে রইলাম।

কি করি একলা বসে বসে ?

একলা আর কি-ই বা করা যায়! হয় গুনগুন, নয়তো মনের স্রোতে ঢেউ তোলা। কিন্তু গলায় শ্রান্তি আসে শিগ্‌গিরই। শুধু মনের স্রোতে ভেসে যাওয়া যায় অনেক দূরে। নির্মুক্ত বিহার তাই শুধু কাব্যলোকে। যত পার পাখা মেলো। মনের ডানা একেবারে আলগা করে দাও।

শিব নটরাজ হলেন কেন ?

যেন একই সঙ্গে কাব্য ও দর্শনের একটি উপাদান পেয়ে গেলাম।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই শিলারাশি। নগ্ন নিরেট সুবিস্তীর্ণ গিরিমালা। যেন ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের অগণিত দোলায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে সত্‌পন্থের চারিপাশে। উন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত ক্ষিপ্ত কিন্তু নির্মমভাবে কঠিন ও নিশ্চল।

এই অচঞ্চল গাম্ভীর্য দেখেই কি শিবের কল্পনা হয়েছে ধ্যান-মৌলি যোগাত্মারূপে ?

বিরাট ঔদার্যে সুবিস্তৃত দিগাঙ্গন জুড়ে হিমালয়ের ধ্যানমৌলি রূপায়ণ। সমগ্র অঙ্গে সুস্নিগ্ধ কান্তির অপূর্ব সুষমা। কালো শিলা আর শ্বেত হিমাদ্রির কোলাকুলিতে বর্ণ-বৈষম্যের অপরূপ

বৈচিত্র। এই বৈচিত্রই বুঝি কবির কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে শিবের অতনু বিভায় আর অপূর্ব অঙ্গ বিভূষণে। ব্যাঘ্রচর্মাবরণে সাদাকালো ডোরা। শ্বেত কণ্ঠে সু-উজ্জ্বল একটি নীল বিন্দু। যেমনটি দেখা যায় শ্বেত হিমাঙ্কিত ওই গিরিশ্রেণীর শিখরে শিখরে।

আর, ভোলা তাপসের ওই জটাজুটের ছন্দায়ণ?

অজস্র ধারায় যে হিমস্তর গলে গলে বিসর্পিল তরঙ্গে নেমে আসছে শিখর থেকে তাই দেখে বুঝি কল্পনা হয়েছে শঙ্করের জটাজুটের। ও জটাজুট শুধু রুক্ষ কঠিন ধূসরাস্তীর্ণ নয়, গঙ্গাবতরণে তরঙ্গ-চঞ্চল।

কি অদ্ভুত কল্পনা! বুকে নয়, আলিঙ্গনে নয়, একেবারে শঙ্করের মাথায় গঙ্গার অধিষ্ঠান। লীলায়িত তনুর এমন সুস্মিত অঙ্গের ঊর্ধ্বে গঙ্গাকে কেন মাথায় তুলে নিলেন শঙ্কর!

পর্বতশীর্ষের ওই তুষার-চাপের দিকে চেয়ে চেয়ে বুঝি তার রহস্য অনুধাবন করা যায়। রুদ্রাণী গঙ্গার হৃদয়াবেগে যেন অনন্ত অতৃপ্তি। অনিরুদ্ধ উদ্দাম। যেন তাই আবেগের তরঙ্গ শিহরণে শঙ্করের সারা অঙ্গ প্লাবিত করে দিয়ে তবে রুদ্রাণী গঙ্গার উন্মত্ত শৃঙ্গার।

পর্বত-শিখরের হিমস্তরে কি প্রচণ্ড চাপ! প্রলয়াবেগের মত থর থর করে কেঁপে উঠছে গিরিমালা। দুরন্ত বেগে পাথর ফাটিয়ে পাহাড় ভাসিয়ে নেমে আসছে বজ্র-কঠিন তুষারপাতের বিগলিত ধারা। পাষাণ পাহাড়ের কোনো বাধাই যেন বাধা নয়। হিমপ্রবাহের দুঃসহ বেগে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খান খান হয়ে বিধ্বংসের মত ছড়িয়ে পড়ছে পর্বতের সুউচ্চ শিখরগুলি। তারই প্রচণ্ড নিনাদ ক্ষণে ক্ষণে বজ্রধ্বনির মত বিকট আতঙ্কে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে সমস্ত দিগাঙ্গন।

চেয়ে চেয়ে দেখছি। শ্বেতশ্রী হিমাদ্রির তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস আর

বিসর্পিল গিরিমালা। ক্ষণে ক্ষণে শুনছি হিমস্তরের বিধ্বংসী পতন। সহস্র হিমপাতের রুদ্র প্রবাহ দেখে দেখে মনে হবে এ যেন গিরি নয়, তুষার নয়। এ যেন রুদ্র-রুদ্রাণীর তাণ্ডব নৃত্যের এক ভয়ঙ্কর বিহার। যেন রোল উঠছে শঙ্করের ডমরুতে ডুম ডুম ডুম ডুম। জাগছে শঙ্কব আর গর্জে উঠছে শঙ্করী। কী শৃঙ্গারাবেগ গঙ্গার! ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই! যেন রুদ্র প্রলয়ের এক অতলান্ত মন্থন! যত মাতে শঙ্কর, তত মাতে শঙ্করী। ডমরু বাজে ডুম ডুম ডুম ডুম। নৃত্যেব তরঙ্গে তরঙ্গে উঠে তাথৈ তাথৈ! ধ্যানমৌলি শঙ্কর ধ্যানভঙ্গের প্রলয় ছন্দে নৃত্যচঞ্চল হয়ে ওঠেন রুদ্র ভৈরবরূপে। মূর্ত হয়ে ওঠে গঙ্গা-লাঞ্ছিত শঙ্করের তাণ্ডব-বিহারী নটরাজেব বিগ্রহ।

নমস্কার তোমায় আদি কবি! হিমালয়েব রূপে যে অগ্নিশিখা জেগে উঠেছিল তোমাব কল্পনায় নটরাজ তারই অপূর্ব রূপায়ণ! ভাবতের রুদ্রমানসেব এক নিরুপম অনুভূতি।

চা না যেন অমৃত। এক এক বিন্দু গলায় যায় আব পরম স্নেহ-স্পর্শে যেন বুলিয়ে বুলিয়ে দেয় রক্তকণাগুলিকে।

ধনসিংয়ের ঝুপরীতে কিছু উদ্‌বৃত্ত আটা ছিল। তাই দিয়ে মুঠো মুঠো করে গরম হালুয়াও হলো।

সত্‌পন্থের গুহা চক্রতীর্থের চেয়েও খারাপ। পাথর ঘামছে। ফাটল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। গুটিগুটি করে তো ঢুকলাম গিয়ে গুহায়। সাধুদের ভাষায় 'গুম্ফায়'। কিন্তু বিছাবো কি? গায়েই বা দেবো কি?

চক্রতীর্থে ঘাসপাতা ছিল। সত্‌পন্থে শুধু নিরেট কঠিন পাথর। তৃণ-গুল্মের একটু রেখামাত্রও নেই যে উপরে এনে বিছিয়ে দেব। গায়ে ছুটো উলের জামা। পরণে পশমের পাজামা। তার উপরে

একটা কম্বল। কিন্তু সব পরেও মনে হচ্ছে, গায়ে যেন ঝুলছে একটা ভিজে তোয়ালে। তার উপরে আবার পাথরের জ্বালা। রাত যত বাড়ছে, পাথরগুলিও যেন নিরুত্তাপের সমাধিতে তত ডুবছে। গায়ের গরম কাপড়গুলি যেন কিছুই নয়। এ-পাশ হয়ে বসি তো মনে হয় যেন আমার পা-টা আর আমার নয়। ও-পাশে গড়াই তো তেমনি বিকলাঙ্গ দশা। এর মধ্যে পাথরের ফাটল দিয়ে এসে এক একটা জলের ফোঁটা পড়ে না তো গায়ে যেন বিচ্ছুর দাঁত ফুটায়।

নগ্ন অবধূত আর কৈলাসানন্দের কোনো অস্থিরতা নেই। বহুবার কৈলাস-মানস ঘুরে এসেছেন তাঁরা। নেপালীরাও শীতের দেশের মানুষ। কিন্তু আমাদের তো প্রায় প্রাণান্তকর অবস্থা। রাত বাড়ছে না তো মনে হচ্ছে যেন বরফের কবর খোঁড়া প্রায় সাঙ্গ হয়ে আসছে।

আরো বার দুই চিনি দুধ ছাড়াই চা হলো। স্টোভের গরমে গরমে হাত সেঁকে শুধু হাতটাই গায়ে এনে লাগাই। আর মনে হয় যেন গোটা স্টোভটাকেই টেনে এনে পুরে রাখি পেটে।

কি করে যে আজ রাত ভোর হবে!

অবধূত মহারাজ যেন কিশোরের মত চপল হয়ে উঠলেন। গল্প কৌতুক হাসি মস্করায় মশগুল।

আরে অজী মোহনদাস! আপ ক্যাসা লীডার! থোড়া তো কুছ কিস্‌সা ভী শুনাও: অবধূত মহারাজের কণ্ঠ।

দুই সাধুরই মোহনদাসের উপরে সস্নেহ দৃষ্টি। মোহনদাসকে লীডার করা হয়েছে। সুযোগ পেলেই মোহনদাসকে তাতিয়ে মাতিয়ে দেন তাঁরা। সাদাসিদে সরল মোহনদাস। অসমীয়া টানের ভারী ভারী শব্দে জড়িয়ে জড়িয়ে মোহনদাস যখন হিন্দী বলে তখন কথাগুলি ওর মুখে ছেলেমানুষের মত মিঠে শোনায়।

ভূতপ্রেতের গল্প ওঠে। মোহনদাস খুব ভূত মানে। অবধূত মানেন না। তাই নিয়ে চলে তুমুল তর্ক। মোহনদাস বলে,—আমি ভূত দেখেছি। অবধূত মহারাজ বলেন,—আমি ভূত ছাড়িয়েছি। এই নিয়ে কিছুক্ষণ চলে কথা কাটাকাটি।

কিন্তু তাও শেষে মিটমাট হয়ে যায়। প্রসঙ্গান্তরে যেয়ে অবধূত মহারাজ আর কৈলাশানন্দ তাঁদের হিমালয় ভ্রমণের গল্প শোনান। যাঁরা গল্প করেন তাঁরা তো না হয় কথা বলে বলে কিছু উত্তপ্ত হন। কিন্তু যারা শোনে! গল্প শুনে শুনে কিছুটা অন্যমনস্কতা আসে বটে, কিন্তু তাতেও কি শীতের ছোবল কমে!

আরো বার দুই শুধু শুধু স্টোভ জ্বেলে হাত সেঁকার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু না, এতেও কুলোচ্ছে না। বাত বাড়ছে না তো দাঁত-কপাটে যেন ভূকম্পন শুরু হয়েছে। শেষে ঠিক হলো সম্মিলিত কণ্ঠে রাতভর ভজন গাওয়া হবে।

তাই ঠিক। গেয়ে গেয়ে গলা গরম হলে শরীরও গরম হবে।

অবধূত মহারাজ প্রথমে ধরলেন। সোজা দু'লাইন কথাকে উঠিয়ে নামিয়ে ধুমবোল দিয়ে টেনে টেনে অনেক বড় করা হলো। প্রায় সবাই ঘুরে ফিরে মূল গায়েন আর দোহারের পাট নিলেন। রাম আর কৃষ্ণ—মাত্র এই কথা দুটিকে নানা সুরে, নানা স্বরে, নানা ব্যঞ্জনায় গাথা হলো। কি মিষ্টিই যে লাগছিল এই ভজন গান!

আহা! কথা নয়তো, গানের কলিগুলি যেন গায়ে বসে বসে ওম দিচ্ছে।

শরীর একটু গরম হলে শুরু হলো গীতা আর বেদ পাঠ। সাধুদের সব কণ্ঠস্থ। সুর করে নানা ছন্দে অধ্যায়ের পর অধ্যায় পাঠ করে চল্লেন তাঁরা। বদ্ধ গুহায় বাতাসও যেন শব্দের দোলা খেয়ে খেয়ে কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠলো।

কিন্তু এতেও যে রাত কাটে না। শেষের দিকে গানের মধ্যেই কখন গান থেমে গেলো। কে কখন এ ওর গায়ে ঢুলে পড়লো। যদি এর গায়ের উত্তাপ ওব গা থেকে একটুও বা কেড়ে নেওয়া যায়!

কৈলাসানন্দ! অজী কৈলাসানন্দ!

অবধূত মহারাজের কণ্ঠ না? চোখ মেলে দেখি পাথব-ঢাকা গুহার মুখটি ফাঁক কবা। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে একা দাঁড়িয়ে অবধূত মহাবাজ কৈলাসানন্দকে ডাকছেন।

কেমন যেন একটা সশঙ্ক মনে আমবাও বেবিযে এলাম ছাতি মাথায়। আধঘণ্টা হলো কৈলাসানন্দ বেরিয়ে গিয়ে আব ফিবছে না। অবধূত মহাবাজ তাই দেখে খোঁজ কবতে বেবিয়েছেন। প্রায় পনেব মিনিট ধবে সবাই মিলে ডাকাডাকি কবলাম। কোনো সাড়া শব্দ নেই তবু।

অন্ধকাবে পাথর থেকে কোথাও পড়ে-টড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো না তো! সবোববেব জলে হাত ধুতে নেমেছিল নাকি! যদি জলে পড়ে গিয়ে থাকে! সাঁতাবও তো জানে না কৈলাসানন্দ।

টর্চেব আলোয় চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চললো। আবাব এক সঙ্গে সবাই ডেকে উঠি: কৈলাসানন্দ! অজী কৈলাসানন্দ!

অনেক ডাকাডাকিব পব কাছেরই আবেকটা অন্ধকার গুহা থেকে একটু জড়ান কণ্ঠেব শব্দ এলো: উঁ।

অজ্ঞান হয়ে গিয়ে গোঙাচ্ছে নাকি? শব্দটা লক্ষ্য কবে একটু দাঁড়িয়ে বইলেন অবধূত মহারাজ। শেষে আমাদেব ডেকে বললেন: চলো গুম্ফা মেঁ!

মানে! মানেটা একটু পরেই বুঝলাম। কৈলাসানন্দ ধ্যান করছেন একলা বসে।

বন্ধ গুহাতেই বসা যায় না। আব ওই খোলা গুহাটার

স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসে ধ্যান! তার উপরে আবাব বৃষ্টিও পড়ছে।

নইলে কি আর ঘরের তুলাল বাইরে এসেছে! ধন-দৌলতের তো কিছুই অভাব নেই ওঁর। কৈলাসানন্দ মস্ত ধনীঘরের বড় ছেলে। ঘর ওকে তবুও বেঁধে রাখতে পারলো না।

ভোরে চোখ খুলে দেখি সাধুদের স্নান সারা। হাসতে হাসতে অবধূত মহারাজ বললেন: অব তো সমঝা, নিন্দ্ কি দেবী কী ক্যাসী শক্তি!

এ ওর পিঠে ঢলে পড়ে কাল রাত শেষে আমরা তু'ফোঁটা ঘুমিয়ে নিয়েছি।

অবশিষ্ট চা-টুকু গরম জলে ভিজিয়ে নুন দিয়ে চুষতে চুষতে অবধূত মহারাজ বললেন: দেখো তো তুম্হারা পূরব জনম কা ক্যাসা দেন! সারে রাত পাঠ-ভজন। অগর কম্বল ইয়া খানা মিলতা তো রাতভর অ্যাসা জাগতে? সত্পন্থ্ মেঁ পাঠ-ভজন মেঁ রাত বিতানা! পরম ভাগ্য কি বাত!

বাব্বা! যা ভাগ্য! মনে মনে বিড়বিড় করি। কিন্তু সত্যি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। নিরালায় কোথাও একলা হলে চিরদিন গুনগুন করবে এ রাতের স্মৃতিটুকু।

আবার কয়েক অধ্যায় গীতা ও বেদপাঠ হলো। তারপর চক্রতীর্থের দিকে পা বাড়ালেন অবধূত মহারাজ। আমরা কায়ার অনুসরণে তাঁর ছায়া হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

রান্না বসেছে চক্রতীর্থে। সাধুরাই উদ্যোগী।

একটা পাথরের উপরে একলা বসে আছে সারথী। কি যেন ভাবছে একলা। ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

সারথী ছবি আঁকতে এসেছে হিমাঞ্চলে, এটুকু জানে সবাই। আমিও তাই শুনেছি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, সব সময়েই কেমন যেন একটা বিমনা ভাব ওর। হয়তো শিল্পীরা এমনিই। মনে মনে এই বলে সংশয়ের নিরসন করার চেষ্টা করতাম।

সারথী অনেকদিন থেকে ঘুরছে এদিকে। কেদারনাথ ও তুঙ্গনাথেও গেছে। পথে পথে থেমে থেমে এসেছে প্রয়োজন না থাকলেও। ও বদ্রীনাথে এসেছে অনেক দিন। অবধূত মহারাজের কাছে খুব যায়। দু'একটা করে স্কেচ করে। আর চায়ের দোকানে বসে বসে যাত্রীদের দেখে। জিজ্ঞেস করলে বলে, ছবি আঁকতে এসেছি। এমন দৃশ্য আর কোথায় পাব। কিন্তু খুব যে মন দিয়ে কিছু আঁকছে তাও নয়। এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে নিজের পসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্টুডিওটাও বন্ধ। আর্ট স্কুলের শিক্ষকতাও কামাই হচ্ছে।

চুলগুলি এরই মধ্যে জট পাকিয়ে উঠেছে। গালভরা চাপ-দাঁড়ি। সব কিছুতেই কেমন যেন একটা এই-হলেই-হল ভাব।

শিল্পীর খেয়াল বলে এ-সব ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তবুও যেন কেমন অস্বাভাবিক লাগতো।

আজ কিন্তু 'কেমনটার' আর সন্দেহ রইল না। নীলকণ্ঠের দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে উন্মনা হয়ে বসে আছে সারথী। নিরুদ্ধ আকাশ যেন ওর আবদ্ধ দমটা খুলে দিল।

দেখছেন কি সুন্দর বাদল! কেমন দু'হাত দিয়ে কত মমতায় জড়িয়ে আছে নীলকণ্ঠকে! কিন্তু তবু কি নিষ্ঠুর! যেই নিবিড় আলিঙ্গনে গিরিশিখর ওকে টেনে নিলো, সুস্নিগ্ধ আবেশটুকু নিবিড় হতে না হতেই কঠিন আঘাতে ও শিখরকেই দিলো ভেঙ্গে-চুরে চুরমার করে। যেন গিরিশিখরকে ভুলানো আর ভাঙ্গানো,—এই বাদলের কাজ।

এমনি কতকগুলি আত্মমন উক্তি করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সারথী।

ঠিক যেন মেয়েদের মত। যতক্ষণ না সে জয় করবে, অবিরাম চলবে তার বিচিত্র লীলা। কত মমতা! কত আগ্রহ! কত আবেগ! কিন্তু যেই সে হলো বিজয়িনী, অমনি মিটে গেলো তার সব তিয়াসা।

মনের ডালটায় ঝাঁকি দিয়ে যেন শিউলি ঝরাতে লাগলো সারথী। আঙ্গুলের ডগায় ডলতে ডলতে যেন একটা শিউলিকে হলুদ করে দিয়ে উত্তেজনার ঝলক দিয়ে উঠলো।

বলতে পারেন, এমনি খেলাতেই কি মেয়েদেব আদিম আনন্দ! বোঝাতে পারেন, পরিপূর্ণ ভালবাসা পেলে কেন আর ওরা ভালবাসতে চায় না?

সারথী যেন ওর পরচুলাগুলি সব ঝাঁকি দিয়ে খুলে ফেললো আজ। রঙ-তুলিতে আর ঢাকা রইল না ওর আসল মানুষটা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবার মূল কারণটা।

কি উত্তর দেবো! উত্তর তো চায়নি ও। এ প্রশ্নগুলি তো ওর ভাব-তরঙ্গের আনমনা ঠোকাঠুকি মাত্র।

মোহনদাসের ডাক এলো। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরেই আবার শুরু হলো যাত্রা। পারি তো আজই গিয়ে পৌঁছবো বদ্রীনাথে। এই অবধূত মহারাজের ইচ্ছে। তাই তিনি যেন ফিরতি পথে আলেয়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে চললেন বদ্রীনাথের দিকে।

ঝরনাগুলি পার হয়ে সহস্র-ঝরার পাশে সজারু কাঁটার মত খাড়াখাড়া সেই কঙ্কাল পাহাড়টার উপরে আবার গিয়ে উঠলাম।

চলেছি ফেরার পথে। সারা পথে কুয়াসার ঘনঘটা। মনে হল কাল থেকে বুঝি খুব একটা বড় শিখর ভেঙ্গে পড়ে আছে সামনে। সহস্র ধারার প্রবাহিকা পার হয়ে উপলে পাথরে বিছিয়ে রয়েছে চারিদিকটা। পাহাড় কঙ্কালটার হাড়ে মাথায় পা ফেলে ফেলে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছি। ব্যালান্স রাখা চাই। জোরে জোরে খুব হাওয়াও দিচ্ছিল। ছাতিটাও তাই বন্ধ করে দিতে হলো। উদ্দাম হাওয়ায় যাত্রীদের নইলে উড়িয়ে নিয়ে যদি খানখান করে ছুড়ে ফেলে দেয় শিলাখণ্ডের মত।

সাধুরা আগে আগে। দেখা যায় না কাউকে। আমরা দুজনে পাথর ঠুকে ঠুকে হাটছি। সারথীও সঙ্গে আছে।

ওদের কাউকে দেখছি না তো! ত্রিকোণলিঙ্গ-এর ঝরনাটা পার হবো কি করে? কুয়াসার মধ্যে কোন্ পথে যাব? হিমস্তূপের কোনো ফাটলে যদি পা পড়ে যায়! কি পাথরই যদি গড়িয়ে পড়ে এসে উপর থেকে! ত্রিকোণলিঙ্গের গ্লেসিয়ার-ভাঙ্গা শিখরের গা-টা ঘেঁষেই তো যেতে হবে!

সারথীর সঙ্গে বলাবলি করতে করতে কঙ্কালটার পিঠ থেকে নেমে এলাম ঝরনার পারে। সারথী যেন একটু রেগেই উঠলো কাউকে না দেখে।

দু'রাতেই ঝরনার জল কোমর সমান উঁচু হয়ে গেছে। আর যা স্রোত! পার হবো কি করে?

ওপারে পিঠের বোঝাটা রেখে এসে ধনসিংহ ঠিক জায়গা মত দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে। একটা জল-কম ধার বেছে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে ধরে ধনসিং পর পর আমাদের পার করে দিলো ঝরনা-নদীটি।

নদীর এপারটিতেও কম বিপদ নয়। বরফে পাথরে ধস-নামা শিখরটার একেবারে গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগুতে হবে। চারিদিকে

বিশালকায় পাথরগুলি হিমস্তূপের উপরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মাথার উপরেও কতগুলি শিখর আর বিরাট পাথর এই পড়ি-পড়ি করে ঝুলে রয়েছে। ফাটল ভরা বরফ। কখন যে জলের উচ্ছ্বাস হবে, আর বিরাট বজ্রনাদ করে ধসে যাবে পাষাণ শিখর কে জানে!

দেখি অবধূত মহারাজ আর কৈলাসানন্দও স্থান বুঝে ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে কিন্তু একটুও ভয় দেখালেন না। কিন্তু মোহনদাসকে আমাদের সঙ্গে আগিয়ে দিয়ে বললেন: অজী লীডার! অব্ আগে চলো! হাম সব পিছে। দেখা তো দো ক্যাসা নওজোয়ান!

দুই সাধুর পিছে আসার কারণ নওজোয়ানেরাও বুঝলো।

অলকাপুরী ছাড়িয়ে অনেকটা সহজ পথে এসে পড়লাম। সারথী এগিয়ে গেছে অবধূত মহারাজের সঙ্গে। মোহনদাস পিছনে।

কথা তোলে মোহনদাসই। বাইরের লোকের সঙ্গে গল্প করতে পারেনি অনেক দিন। সুযোগ বুঝে, প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা বেরোয় নবীন সন্ন্যাসীর মুখ থেকে। সেগুলি জোড়া দিলে দাঁড়ায়: আই-এ পড়তে পড়তে মোহনদাস যুদ্ধের সময় সেনাবিভাগে ঢোকে। কমিশন পেয়ে বর্মার যুদ্ধেও গিয়েছিল। ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়মেও ছিল কিছুদিন। বড় ভাই আছেন শিলংএ। বছর কয়েক আগে সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করতেন।

হালকা কথায় অনর্গল হলে কি হবে, আসল স্থানে ঠিক আগল-আঁটা। ভাইয়ের নাম বললো না। নিজের আগের নামও গোপন করে গেলো।

সন্ন্যাসী হলেন কেন? প্রশ্ন করি মোহনদাসকে

আমি কি জানতাম! বরং সাধুদের ভিক্ষে করতে দেখলে রাগ হতো আগে। গালিও দিতাম খুব।

মোহনদাস সাধুদের কেমন গালমন্দ করতো তার একটা গল্পও শোনালো।

ছোটবেলা কোলকাতা গিয়েছিলাম এক আত্মীয়ের বাড়ী। কালিঘাটের কাছে। এক সন্ন্যাসিনী ভিক্ষা করতে এলে খুব গালা-গালি দিলাম: ভিক্ষে করো কেন? কাজ করে খেতে পার না?

খুব একটা রাগলো না সন্ন্যাসিনী। যাবার সময় শুধু বলে গেলো: আরে তোকেও তো একদিন ভিক্ষে করেই খেতে হবে। মা শুনে খুব গালমন্দ করলেন। কিন্তু সেদিন ওসব গ্রাহ্যও করিনি।

যুদ্ধের পরে কিছুদিন ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ভারতের অনেক জায়গায় গেছি। তীর্থেও। শার্ট-প্যানটুলন পরি। হোটেলেই থাকি। পাহাড় দেখবার খেয়ালে এসে গেলাম সেবার যোশীমঠে। সেখানেই নাঙ্গাবাবার কাছে সন্ন্যাস নিই।

নাঙ্গাবাবা মানে যোশীমঠের সেই অতি বৃদ্ধ জটাজুট সন্ন্যাসী। কেন যে সন্ন্যাস নিলো মোহনদাস তার বিশ্লেষণ করেনি। শুধু বলে, ভালো লেগে গেলো নাঙ্গাবাবাকে।

কথাগুলি শুনি আর তাকিয়ে দেখি মোহনদাসের দিকে। ছোট্ট চোখ দুটি ওর। স্বচ্ছ ও চঞ্চল। মুখের ভাবটা সরলতায় লেপাপোছা। কোমরে একটা মোটা দড়ি বাঁধা। তারই গায়ে আটকানো একটু কৌপীন। মাথার জটা বেড়িয়ে একটা চাদর ঝুলছে খালি গায়ে। পায়ে কোনো জুতো নেই।

বড় ছেলেমানুষ! একটু স্নেহস্পর্শ পেলেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পারবে ও সন্ন্যাসের কাঠিন্য বইতে?

আবার টুকরো টুকরো কথা তোলে মোহনদাসই: কিছু

টাকা ছিল।, বিলিয়ে দিয়ে ঝেড়েমুছে ফেলেছি সব। জামা-কাপড়গুলিও। সন্ন্যাসীদের আবার বেশবাস কি? মাধুকরীই তো সন্ন্যাসীদের জীবন।

চলে আর আধ্যাত্ম সাধনার নানা কথা শোনায় মোহনদাস।

আগে ভাবতাম অন্যের সহায়তায় ঈশ্বর-দর্শন হয়। এখন বুঝেছি নিজেরটা নিজেই করে নিতে হয়। তাই সাধুদের কাছেও আর বেশী যাই না। সাধন-ভজন নিয়ে নিজেই থাকি নিজের গুহায়।

বদ্রীনাথ থেকে আধ মাইল দূরে নিরালা একটা গুহায় একলা থাকে মোহনদাস। ধর্মশালা থেকে ভিক্ষে এনে দিনে একবার মাত্র খায়। রাতে শুধু একটু চা। এক শেঠ দেয়। এই তার দিন-রাতের আহার।

রাতে খান না কেন?

একবারের বেশী খেতে নেই সন্ন্যাসীদের। সাধন-ভজনে বিঘ্ন ঘটে। প্রবৃত্তি জট পাকায়।—পাকা সাধুর মত উত্তর দেয় মোহনদাস।

জনসেবা করেও তো ভগবৎসাধনা করা যায়? খোঁচা দেওয়ার জন্যে একটা বিজ্ঞতার ধাঁধা বাড়াই ওর দিকে।

কিন্তু ছেলেমানুষ হলেও কাবু হয় না মোহনদাস। কথাটাকে অনায়াসে উড়িয়ে দেয় প্রত্যুত্তরে।

যার নিজের ভিতরেই কোনো আলো নেই সে আবার অন্যকে আলো দেবে কি!

যুবক মোহনদাস। এ বয়সে মনের আঙ্গিনায় কত ফুল ফোটে। কিন্তু ও সব ফুলই উপড়ে ফেলে দিতে উদ্যত শুধু একটি মাত্র সূর্য-মুখীর প্রত্যাশায়। কিন্তু পরমার্থের কোন অর্থই যদি খুঁজে না পায় মোহনদাস? আজ ওর জীবনে আবেগ আছে। তারুণ্যের একগুয়েমী আছে। কিন্তু পড়ন্ত বয়সে?

বদ্রীনাথের গুটিকয়েক গেরুয়াবাস সন্ন্যাসীর ভাঙ্গা-চোরা মুখের

বিবর্ণ ছবিগুলি যেন পর পর ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কি শীর্ণ-বিশীর্ণ! কি করুণ ওই মুখগুলি!

মাত্র তো চার বছরের সন্ন্যাস মোহনদাসেব। মন এখনও চঞ্চল। শত কৃচ্ছ্রতায়ও যদি শান্তির ছোঁয়া না পায়! তখন? মনে মনে ভাবি আব চোখের প্রশ্ন তুলে ধরি মোহনদাসের দিকে। যেন অস্ফুট জিজ্ঞাসাটা খোঁচা দেয় গিয়ে মোহনদাসকে। নিষ্কম্প কণ্ঠে নিজেই যেন নিজেকে বলে :

—যদি ভগবানকে না পাই! কি হবে এ জীবন দিয়ে!… তবে!…স্বল্প কিন্তু একটা শক্ত সঙ্কল্পেব কথা উচ্চাবণ করে মোহনদাস।

না না! ভগবান যদি থাকো এমন যেন না হয়! ওব এ-আকুতি যেন ব্যর্থ না হয! মনে মনে একটা মমতাব ঢেউ ওঠে মোহনদাসের জন্য।

সন্ধ্যাব আগেই সেই লক্ষ্মীবনেব তলায় এসে গেলাম। এব নিচেই প্রায় আধ মাইল পাহাড় ভেঙ্গেচুরে গিয়ে স্তূপীকৃত হয়ে রযেছে অলকনন্দাব পাব অবধি। এটাব জন্যই যাওয়ার পথে পাহাড় ডিঙ্গিযে ঘুবে যেতে হয়েছিল মাইল কয়েক।

লক্ষ্মীবনে ঘাস নিতে-আসা এক পাহাড়ী বললো যে স্তূপেব নিচে অলকনন্দার উপবে একটা হিমস্তর পড়ে আছে। ওর উপব দিয়েই হেঁটে পার হয়ে যাওয়া যাবে।

কিন্তু এই স্তূপটার কাছে গিয়ে থমকে গেলেন অবধূত মহারাজ। অলকনন্দার ওপরের লম্বা হিমস্তরটি ফেটে গিয়ে বিরাট একটা হাঁ কবে পড়ে আছে।

কি করবো এখন? ঘুরে যেতে হলে যে রাত হয়ে যাবে! কিন্তু এগুনোও বড় ঝুঁকি! পা ফস্‌কে অলকন॰ায় পড়ে গেলে

হাতিও ঐ স্রোত ঠেলে আর উঠতে পারবে না। আর যদি হিমস্তরের ফাটলে পড়ে যায় কেউ তাহলে জীবন্ত হিম-সমাধি। ডান পাশের বিরাট ধসটি আবার এমন আলগাভাবে ঝুলে আছে যে কখন হুমড়ি খেয়ে বিরাটকায় পাথরগুলি পড়বে এসে যাত্রীদের মাথায় তারও ঠিক নেই। গোটা ধসটা নেমে না এলেও বৃষ্টির ছাঁটে আলগা শিলাপিণ্ডগুলি পর পর যে ভাবে গড়িয়ে আসছে, তার একটা এসে পড়লেও মাথাটা নিমিষে চৌচির হয়ে যাবে।

সদাহাসি অবধূত মহারাজও গম্ভীর হয়ে গেলেন। সবাই খুব জোর করে হাতে হাত ধরলো। আগে পাহাড়ী। তারপর অবধূত মহারাজ। ধসের ওপরেই সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে শরীরের ভর বইতে পারবে কিনা তাই পরখ করে করে এগুতে লাগলেন সবাই।

অত বড় একটা বোঝা পিঠে নিয়েও যেন লোহার খাপে হাতটা আমার আঁকড়ে ধরলো এসে ধনসিংহ।

এক ফারলঙ দেড় ফারলঙ রাস্তা পার হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেলো। ফাঁড়াটা কাটলে পাহাড়ী এসে অবধূত মহারাজের কাছে হাত জোড় করে সকাতরে বললো যে যাওয়ার সময় হিমস্তরটা আস্তই দেখে গিয়েছিল সে: মুঝে মাফ কিজিয়েগা মহারাজ!

এবার অবধূত মহারাজ মোহনদাসের দিকে চেয়ে গালভরা হাসি দিলেন: আরে লীডার হামারা মোহনদাস! কই রোখ্ সাকতা হমকো! জয় বদ্রীবিশালা!

পারে এনে নাও ভিড়িয়ে পাকা মাঝির পরিতৃপ্তিতে চোখমুখ ভরে উঠল অবধূত মহারাজের।

সারারাত বিশ্রামে গা-টা ঝরঝরে হয়ে উঠলো।

ফিরে এসে সারথীও আমার ঘরেই উঠেছে॥

পাশের খাটে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছে সারথী। চক্রতীর্থের পর থেকেই কেমন যেন অনমনা ভাব। চোখ মুখ ঘিরে একটা থমকানো ছায়া। নীলকণ্ঠ যে মন্থন শুরু করেছিল এখনও যে তারই ঢেউ চলছে বোঝা যায় সেকথা। ভাবলাম ওর অব্যক্তির গুমোটটি কথার হাওয়া দিয়ে ভাসিয়ে দেই। হাল্কা হবে তাতে মনটা।

চক্রতীর্থের প্রশ্নটা কিন্তু অমনি রয়ে গেলো সারথী!—ওর বিগত কথার সলতেটা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করি।

ও! সে শুনে আর কি হবে! আমি নিজেই তার কোনো উত্তর পাই নে!—আপত্তির সুরে এদিকে ওদিকে মাথা নাড়ে সারথী।

আবার একথা সেকথা তুলে আরো একটু হাওয়া দিই ওর মনকে।

কিন্তু সবটা আমার কাছেও এমন দুর্বোধ্য! নিজেও বুঝি না কেন এমন হলো! টানা টানা সংলাপ আবার শুরু করে সারথী।

ভাবীর বোন সুজাতা সব সময়েই আসতো আমাদের বাসায়। সুজাতাদের বাসা আমাদের পাশেই ছিল। ও পড়ে তখন স্কুলে। আমি ফার্স্ট ইয়ারে। স্কুলের যত গল্প এসে করা চাই আমার কাছে। আমার ছবি আঁকার সময়ও পাশে বসে বসে সব সময় কলকল করতো। মাঝে মাঝে এখানে ওখানেও যেতাম ওকে নিয়ে। এমনি মেলামেশায় আপত্তিও ছিল না, ভাবাভাবিও ছিল না কারো।

আই-এ দিতে না দিতেই পিতাজী একদিন ডেকে পাঠালেন আমাকে। দেখি সুজাতার বাবাও বসে আছেন পিতাজীর ঘরে।

পিতাজী বিশেষ ভূমিকা না করেই বললেন: আসছে মাসে তোমার বিয়ে ঠিক হলো। সুজাতার সঙ্গে।

এমন আচমকা ভাবে কথাটা উঠবে একবারও মনে হয়নি

আমার। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কি বলবো এ-কথায়। তবু বলে ফেললাম : কাল বলবো।

কাল বলবো! বিস্মিত কণ্ঠে পিতাজী পুনরুক্তি করলেন আমার কথাটি।

এ-বাড়ীতে পিতাজীর উপরে আবার কোনো কথা আছে এটা পিতাজীর জানা ছিল না। বাড়ীর অন্যদেরও না। পিতাজী যেন একটা হোচট্ খেয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন।

পিতাজীর কাছ থেকে সোজা গেলাম সুজাতাদের বাড়ী।

সুজাতার সঙ্গে বিয়ে এজন্যে বিস্মিত হই নি। এক্ষুনি বিয়ে, এ-জন্যে। পড়াশুনা শেষ না করেই বিয়ে করবো কোনো দিন ভুলেও আমার মনে আসেনি এ-চিন্তা। সুজাতাব নামটা ওঠায় তখনই 'না' বলে দিতে পারিনি।

সুজাতাদের বাড়ী যেতে যেতে সুজাতা কেমন যেন নূতন হয়ে উঠলো আমার কাছে।

শুনেছ তুমি? পড়ার ঘরে ঢুকেই কথাটা ফেকে দিলাম সুজাতাকে।

সুজাতা যেন কিছুই শুনলো না। চুপ করে মুখ গুঁজে বসে রইল।

অমন কলকলে মেয়েটা বই ছেড়ে মুখ তোলে না দেখে আবার বললাম : শুনেছো?

মাথাটা শুধু একটু ঝুঁকালো সুজাতা।

নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে আমি বিয়ে করবো না। ছোটবেলা থেকেই এটা আমার সঙ্কল্প। সুজাতাকে বললাম সেকথা। শেষে একটু আবেদন করেই বললাম : কিছুদিন অপেক্ষা কর সুজাতা! আর্ট স্কুলের কোর্সটা শেষ করে একটা স্টুডিও দিয়ে নিই!

কিন্তু পিতাজী!—সুজাতার জড়ানো কণ্ঠে আশঙ্কার উদ্বেগ।

সুজাতার পিতাজী অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না। ভুলিভালী

সুজাতারও মুখ ফুটে কিছু বলার মত সাহস হলো না। একদিন সন্ধ্যায় এসে অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে বসে রইলো আমার টেবিলের পাশে। মনে হলো চোখ দুটো যেন ফোলা।

কিন্তু মাথায় আমার জেদ চেপেই রইল।

সুজাতার বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের দিনটা যেন অসহ্য লাগলো। যা এলো মনে, লিখে গেলাম আমার ডাইরীতে। লিখে লিখে মনটাকে হালকা করার জন্যে '

বলতে বলতে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সারথী। যেন অতীত ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করছে। তারই ব্যাখ্যা করে আবার শুরু করলো :

সুজাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম কি বাসিনি সে কথা বুঝবার মত তখন আমার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ভুলিভালী অমন মিশুক মেয়েটার জন্যে বড় কষ্ট হয়েছিলো। আজ মনে হয়, বুঝি ওটা ছিল শুধু আমার নরম মনের সজলতা আর তারুণ্যের প্রথম উন্মেষ মাত্র।

আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়েই একটা স্টুডিও খুলি। অনেক ছাত্র-ছাত্রী আসে। একটা স্কুলে আর্টও শিখাই। আর্টেই মেতে আছি। না সুজাতার কথা মনে পড়ে, না সেদিনের ছেলেমির লেখাটা।

একদিন কিন্তু ভারী বিস্মিত হয়ে গেলাম। হারিয়ে গেছে এমন একটা পুরানো জিনিস পেয়ে গেলে যেমন হয়। 'মঞ্জুষা' পড়তে পড়তে দেখি কে যেন আমার ডাইরীটা প্রায় হুবহু বসিয়ে দিয়েছে একটা গল্পের মাঝখানে। পাতাটি উলটিয়ে দেখি গল্পটি লিখেছেন এক মহিলা। শ্রীনন্দাদেবী।

কে এই শ্রীনন্দাদেবী! কি করে পেলেন তিনি আমার ডাইরীটা? সমস্ত স্মৃতি মন্থন করেও তার কোনো সন্ধান পেলাম না।

শ্রীনন্দাদেবীর খোঁজ দিলো ভাবী। ভাবীর বান্ধবীর বোন তিনি। এম-এ দিয়ে একটা মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছেন। আমাদের বাড়ীতেও নাকি ভাবীর কাছে মাঝে মাঝে আসেন। হয়তো আমার কোনো টেবিলে পড়েছিল ডাইরীটা। তাই থেকে টুকে নিয়েছেন গল্পের প্লট হিসেবে।

হোক না লেখিকা! তবুও তো জিজ্ঞেস করতে হয়! খুব রাগ হলো অপরিচিতা এই শ্রীনন্দাদেবীর ওপরে।

কেমন যেন আবার একটা আকর্ষণও হলো। ভাবীর কাছে যখন আসতো, তেমন লক্ষ্য করিনি। কিন্তু গল্পের প্লট আর পরিণতিটায় যেন আকস্মিক একটা কৌতূহল হল শ্রীনন্দাদেবীর সম্বন্ধে।

ভাবীর কাছে শুনলাম, বাড়ীতে এলে আমার ঘরে গিয়ে ছবির এ্যালবামগুলি নাকি প্রায়ই খুলে খুলে দেখেন

শ্রীনন্দাদেবীকে ভাবীর কাছে রেখে সারথী নিজের পারিবারিক পরিচয়ের দিকে ওর কথার মোড় ফেরালো।

বাড়ীর মধ্যে সবদিক দিয়েই আমি খাপছাড়া। কি করে যে আর্টে মন গেলো আমার, ভেবে আশ্চর্য হই। পিতাজী ব্যবসায়ী। খালি বোঝেন টাকা। ধন জন আর লৌকিকতা —এই পিতাজীর লক্ষ্য। বাড়ীতে মাছ মাংস খায় সবাই। পানাসক্তিও আছে পরিবারে। এটা কেউ দোষনীয় বলে মনে করে না। পুরানো রীতির জের চলছে এখনো আমাদের বাড়ীতে।

আমার কিন্তু এসবে খুবই অপচ্ছন্দ। আমি মাছ মাংস খাই না। মাঝে মাঝে উপবাসও করি। ঘরে আমার গান্ধী অরবিন্দের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। বিবেকানন্দের বইয়ে আলমারি ভরা।

পিতাজীর সব সময়ে ভয়, পাছে আমি বিবাগী হয়ে যাই।

কারণ পরিবারের রীতি অনুযায়ী আমার সবটাতেই প্রায় অমিল। ভাইবোনদের যে বয়সে বিয়ে হয়েছে আমার ক্ষেত্রে তা অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। পিতাজী বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করে বারকয়েক পাত্রীও ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হইনি।

ছোট ছেলে আর একরোখা বলে বাড়ীতে থেকেও আমি আমার নিজের খেয়াল মতই চলতাম। পিতাজী তো রেগে গিয়ে একবার অনশন শুরু করে দিলেন। প্রতিবাদে আমিও উপোস করে শুয়ে রইলাম। দু'দিন পরে পিতাজীই হার মেনে নিজে খেয়ে আমাকে খাওয়ালেন।

এরপর থেকে বাড়ীতে আমার স্বাধীনতা প্রায় নিরঙ্কুশ হয়ে গেলো। আমার উপরে কেউ আর কোনো কথা বলেন না।

শাদী করবে না তুমি? সারথীর কথাব মাঝে একটু ফোড়ন দিই।

সাদাসিধে সারথী খোলাখুলি ভাবেই উত্তর দেয়: বিয়ে আমি করবো না কোনদিন এমন কথা ভাবিনি। মেয়েদের আমার ভাল লাগে। সুযোগ পেলেই আমি ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। আর্টের মডেল গড়ি। কিন্তু কোনো মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিনি। ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। কিন্তু একটা সীমানায় এসে নিজেরাই আর পা বাড়াতে ভরসা পায়নি।

আমার কল্পনা কি জানেন? এমন একটি মেয়েকে আমি চাই যে আমার আদর্শকে ভালবাসবে। আমার শিল্প-সাধনাই হবে যার সব। আমাকে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকার প্রেরণা দেবে। নূতন নূতন আইডিয়া দেবে। যেন এই কল্পনাটিই ছিল আমার কবিতা। মনে মনে কতবার আবৃত্তি করতাম স্কেচে করতে করতে।

সুদূর কোন্ এক মানসীর কল্পনায় সারথীর চোখ দুটি যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কালো, সাধারণ চেহারা সারথীর। তবুও যেন ভাবে ডোবা মুখখানা ওর মুহূর্তের জন্য একটা পটে আঁকা ছবির মত মনে হতে লাগলো। সারথী সত্যি শিল্পী। শিল্পের কথায় এমন তন্ময়তা ওর। আনমনা আত্মভোলা ছেলেটা আর্টের কথা পেলে আর সব ভুলে যায়। কোন্ মিউজিয়ামে কি কি সুন্দর ছবি আছে। কোন্ আর্টিষ্ট একটি ছবি বিক্রি না করেও সারাজীবন শুধু ছবি এঁকেই গেলো—দারিদ্র্যে দারিদ্র্যে সারাজীবন জীর্ণ হয়ে গেলেও তবু ভ্রূক্ষেপ করলো না। জাপানী আর্ট আর ইটালীয়ান আর্টের মধ্যে পার্থক্য কি। ইণ্ডিয়ান আর্টের বৈশিষ্ট্য কোথায়। সুযোগ পেলেই সারথী আর্টের অফুরন্ত গল্পের ডালা খুলে ধরে।

এ-কয়দিন ওর চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে আমিও যেন শিল্পী হয়ে উঠেছি। বদ্রীনাথের গাছ-পাথরগুলিও কেমন যেন নূতন লাগছে।

শ্রীনন্দাদেবী আবার এসে গেলেন সারথীর কণ্ঠে।

একদিন স্টুডিওতে শ্রীনন্দাদেবী নিজেই এসে হাজির। আর্ট শিখবেন।

কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেলাম ওকে স্টুডিওতে দেখে। সুলেখিকা, অধ্যাপিকা। উনি আবার আর্ট শিখবেন কি!

আমার কাঁপা চাউনি দেখে বোধ হয় ধরে ফেললেন সবিস্ময় প্রশ্নটা!

শ্রীনন্দাদেবী গলায় একটু যেন ছেলেমানুষীর ঢেউ তুলে বললেন: ওমা! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? সত্যি আমি আর্ট শিখবো আপনার কাছে। দেখুন না গুরুবরণ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি!

শ্রীনন্দাদেবীর হাতে একটা আর্টের বই। আধুনিক জাপানী আর্টের সচিত্র ক্রিটিসিজম্।

ভাবীর কাছে হয়তো দেখেছি। কিন্তু শ্রীনন্দাদেবীর সঙ্গে কথা বলিনি কখনো। প্রথম কথার পরিচয়েই এমন আব্দারী সুরটা ঠিক ভাল লাগলো কিনা বুঝে উঠতে পাবলাম না। কিন্তু আর্টের বইটা হাতে পেয়ে মনটা আপনিতেই উষ্ণ হয়ে উঠলো।

সেই থেকে শ্রীনন্দাদেবী সপ্তাহে দুদিন করে স্টুডিওতে আসেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মনটা বলতে লাগলো ও প্রতিদিনই আসুক। শ্রীনন্দাদেবীব দেওয়া বই থেকে দিন কয়েকেব মধ্যেই ক'টা জাপানী স্টাইলের স্কেচ কবে ফেললাম। তুলিটাও যেন আকস্মিক নিপুণ হয়ে উঠলো। যা ধবি তাই উঠে।

আঁকি আর ভাবি : এলো নাকি আমাব কল্পনা! যে আমাকে আইডিয়া দেবে! দেবে আনায শিল্পীব অনুভূতি!

সাবথীব কথা শুনে অকস্মাৎ বেসুবো একটা হাসি বেবিয়ে গেলো আমাব মুখ দিয়ে।

হাসছেন যে ?—যেন লজ্জা পেয়ে গেলো সাবথী।

কল্পনা আব আইডিয়া কথাটায় এমন আমোদ লাগছিল। শিল্পেব আইডিয়া দিয়ে শিল্পীব প্রেম। অবিচ্ছিন্ন শিল্প আর শিল্পী! মানসীর আইডিয়া! ঝলক-দেওয়া চিন্তাগুলি ঠোঁটে ঠোঁটেই চাপা রইল।

কথার মালাটা যেন ছিঁডে যায় না তাই মুখের হাসিটাকে সজোরে আটকে দিয়ে বললাম : এই সারথি! রেশ ভেঙ্গো না। ···বলো! হ্যাঁ, তাবপর ?

সারথীর মনে তখন দখিণের হাওয়া বইছে। কথার ছেদটা নিজেই মুছে দিয়ে তুলতে লাগলো নিজের কথামালায়।

সেই থেকে শ্রীনন্দাদেবী আমার ছাত্রী। সপ্তাহে দুদিন শেখার কথা। কিন্তু মাস না গড়াতে প্রায় প্রতিদিনই আসতে লাগলো স্টুডিওতে।

নতুন নতুন আর্টের বই কেনে। অনেক দামী বইও অর্ডার দিয়ে আনায় বিদেশ থেকে। খুলে খুলে দেখায় আমাকে, আর রেখে যায় স্টুডিওর সেল্‌ফে।

এমন কি ওর লেখা গল্পের প্লটে পর্যন্ত আর্টের ছোঁয়া লাগতে লাগলো। আর্ট নিয়ে গল্প। নয়তো নায়ক আর্টিষ্ট।

সত্যি বলছি আপনাকে, শ্রীনন্দা যেন রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে গেলো আমার অনুভূতিতে। এক এক সময় কি যে করতাম! আঁকতে আঁকতে তুলি কখন থেমে গিয়ে চোখ দুটি যেন ঠেকে থাকতো গিয়ে ওর মুখের পটে। যেন ও মানবী নয়! যেন একটা তুলতুলে সুডোল কল্পনা রক্ত-মাংসের ছন্দ বেঁধে শ্রীনন্দা হয়ে উঠেছে!

স্কেচ থেকে মুখ তুলে শ্রীনন্দা ধমকে উঠতো: এই কি হচ্ছে! তুলি নড়ছে না যে তোমার? এই বুঝি আর্ট!

কোনদিন হয়তো বলতো: হয়েছে আঁকা! মোটে নেই নতুন আইডিয়া! ও পুরানো স্কেচ নিয়ে আর হিজিবিজি করতে হবে না। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।

এমনিভাবে প্রায় বছর কেটে গেলো।

একদিন বড় আনমনা মনে হলো শ্রীনন্দাকে। সন্ধ্যাবেলা এসে টেনে নিয়ে গেলো আমায় মিউজিয়ামের মাঠে।

একটা পামগাছে ঠেস দিয়ে বসে আছি। শ্রীনন্দা নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। আর নাড়াচাড়া করছে আমার আঙ্গুলগুলি।

আঙ্গুলগুলি তো আর অচেনা নয় ওর! তবুও যেন মিলিয়ে মিলিয়ে কি একটা কথার সুর বাঁধছিল শ্রীনন্দা।

চুলটা ওর আলগোছা করে দিয়ে বল্লাম: নন্দা, কথা কও কি হলো তোমার আজ!

কেমন যেন মৌন হয়ে গেলো আজ শ্রীনন্দা। ডান হাতটা ওর তুলে নিলাম মুঠোর মধ্যে।

তবুও কথা কয় না শ্রীনন্দা। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেই রইল। অনেকক্ষণ পরে দূর থেকে ভেসে-আসা বাঁশীর সুরের মত একটু যেন ক্ষীণ সুর ভেসে উঠলো ওর ঠোঁট দুটিতে।

······তুমি আমায়....ভালবাস সারথী?

কথাটির উত্তর না দিয়ে শুধু হাত বুলিয়ে দিলাম শ্রীনন্দার গায়ে। কি বলবো! বলা তো দুটি কথা শুধু! কথার পাপড়ি খুলেও আরো যে পল্লবগুলি ফুটে বেরুবে না কি হবে তাদের ভাষা!

তবু বল্‌লাম: আমি ভগবানকে ভালবাসি! আর্টকে! আর তোমাকে!

শ্রীনন্দা মুখ তুলে ক্ষণিকের জন্য তাকালো আমার দিকে। আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর কোনো কথা না বলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লো: চলো!

ভগবান! আর্ট! তারপর নন্দা! নন্দা হলো দু'য়ের শেষে তিন! নির্বোধ শিল্পী! কথাগুলি মনের মধ্যে ধমকের মত ফোঁস-ফোঁস করে উঠলেও শুধু একটু ঝাজ দিয়ে বল্‌লাম: কেন তুমি বললে না তখন,—নন্দা! তুমিই আমার উৎস! আমার আর্ট! আমার আইডিয়া! তুমিই সব নন্দা!

মনে হলো যেন বুঝলো না সারথী কথাটার মর্মার্থ। রেখার শিল্পীর কাছে মনের রূপায়ণ যেন অস্পষ্টই রয়ে গেলো। নাকি ও ইচ্ছে করেই কিছু বললো না? কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সারথী।

তারপর?

সারথী আবার বলে চলে। সারা মন ওর তখন আবেশে পূর্ণ। শ্রীনন্দা ও কথা নিয়ে আর কথা তোলেনি। মাঝে মাঝে

এমন এক-একটা কথা ফুটতো ওর মুখে যা শুনে আকস্মিক খুব গ্রস্ত মনে হতো আমার।

—তোমার এ ছবিটার দাম কত সারথী ? সেই কিষাণী বউ-এর ছবিটা কত বিক্রী হলো প্রদর্শনীতে ? আর্ট স্কুলে এত কম দেয় কেন তোমাকে ?

ফিনিস করতে করতে হঠাৎ একটা রঙের বাটি উল্‌টে পড়ে সারা ছবিটা নষ্ট হয়ে গেলে মনটা যেমন মুষড়ে পড়ে, শ্রীনন্দার এসব প্রশ্নেও আমার তেমনি বড় খারাপ লাগতো।

এ কী সব বলছে শ্রীনন্দা! ওর না শিল্প আর শিল্পীর জীবন নিয়ে কত আইডিয়া! ও না কতদিন বলেছে: তিনটে ঘর থাকবে আমাদের। একটা স্টুডিও। একটা শ্রীনন্দার। একটা আমার। শ্রীনন্দা আর আমার দুজনের ঘরের মাঝে থাকবে একটা বাগান। তাই হবে আমাদের স্টুডিওর অঙ্গন। আঁকতে আঁকতে যখন আর নূতন আইডিয়া আসবে না তখন শ্রীনন্দা আর আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াব ভারতের শিল্প-তীর্থগুলিতে। অবনীন্দ্রনাথ যা করেছেন, আমিও তাই করবো। যাবো রামেশ্বর মাদুরায় অজন্তায় এলোরায় কুমায়ুঁতে। অলকনন্দা-মন্দাকিনীর পারে পারে করবো শিল্প-তীর্থের সন্ধান। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে ঘুরে স্কেচ করে নিয়ে আসবো ওসব প্রাচীন মূর্তির অপূর্ব ব্যঞ্জনা। স্টুডিওতে এসে তাই রঙ-তুলিতে ডেভেলপ করবো। শ্রীনন্দা লাইব্রেরী খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসবে বই। আর তাই থেকে শোনাবে আমায় প্রাচীন মূর্তি ও মন্দির রচনার বিস্মৃত ইতিহাস ও দর্শন।

কতদিন না শ্রীনন্দা আর আমি বসে বসে প্ল্যান করেছি আর্টের বই লেখার! আমি আঁকবো, শ্রীনন্দা লিখবে। আমি ভাব আর বর্ণ দেবো ও দেবে ভাষা। আমাদের বইয়ের নাম হবে—ভারতের মর্মবাণী। একথা বুঝাবার চেষ্টা করবো আমরা যে

ভারতীয় আর্টের পরিচয় রূপে নয়—অরূপে, প্রকাশে নয়—প্রতীকে। ভারতীয় শিল্পে ভাব আছে, বর্ণনা নেই। সূচনা আছে, সমাপ্তি নেই। ভাবতীয় শিল্প হলো তা-ই, যা সমুখের দৃষ্টিকে নিয়ে যায় অন্তর্দৃষ্টিতে,—অসীমের আদি-অন্তের অতলান্ত মন্থনে। ভারতীয় আর্টের এ-বাণীই না আমরা মূর্তিমন্ত করে তুলে ধরবো বিশ্বের কাছে! আমার তুলিতে শ্রীনন্দার বাণীতে!

শিল্পীর সারা মুখে যেন সৃষ্টির আমন্ত্রণ। যেন কোন্ সুদূরের স্বপ্নে তন্ময় হয়ে উঠেছে ওব চোখছুটি! কল্পনাব আবেগে উষ্ণতায় সারথীর ঠোঁট ছুটি কচি পাতাব মত যেন কাঁপতে লাগলো।

মগ্ন হয়ে বলতে লাগলো সারথী: আমাদের এই কল্পনা! এত আইডিয়া!......তবে কি আর্ট শ্রীনন্দাব অনুধ্যান নয়?

এ-ভাবনাগুলি যেন বুকে আমাব সূঁচ ফুটাতে লাগলো। কল্পনাব চাঁদে যেন কালো কালো দাগ বসিয়ে দিলো ওব প্রশ্নগুলি।

শ্রীনন্দা আসে। গল্প করে। তেমনি ওব কল্পনার কথা শোনায়। আমাদের তিনটে ঘবেব কোন্ ঘরে কোন্ ছবিটা রাখবে। যে বইটা লেখা হবে, তার কি কি অনুচ্ছেদ হবে। প্রচ্ছদপটের আইডিয়াটা কি হবে। এমনি অনেক কিছু।

শ্রীনন্দার কথা শুনে শুনে ছেঁড়া তাবে যেন আবার জোড়া দিই। সংশয়েব কালো মেঘগুলি হাওয়া দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

নিপুণ কথকের মত সারথী বুনে বুনে চলছে ওর কাহিনী। তন্ময় হয়ে শুনছি ওর শিল্প আর কল্পনার সংলাপ। শিল্পী সারথী যেন সাহিত্যিকও।

সেদিন সকালে বসে বসে শ্রীনন্দার একটা স্কেচ করছি। সোমদেও এসে ঢুকলো স্টুডিওতে। কেমন যেন উত্তেজিত মনে হলো ওকে। সোমদেও আমার ছোটবেলার ক্লাস-ফ্রেণ্ড।

কোনো কথার ভূমিকা না করে উচ্চকণ্ঠে সোজা জিজ্ঞেস করলো সোমদেও : শ্রীনন্দার নাকি বিয়ে ! তুই জানিস ?

শ্রীনন্দার বিয়ে ! সোমদেও-এর কথাটা যেন জিভে চোট খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, শ্রীনন্দার বিয়ে। তুই জানিস না ? মানে কি ?

সোমদেও-এর জিজ্ঞাসায় সংবাদটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কি বলবো আর কি যে করবো আমি কিছুই যেন হাতড়িয়ে পাচ্ছিলাম না। অচঞ্চল জলে হঠাৎ একটা ঢিল পড়লে যেমন হয়। বুকটা এমন দুঃসহভাবে তোলপাড় করতে লাগলো !

সোমদেও আরও জানালো। ভিয়েনা-ফেরৎ এক আই-স্পেশালিস্টের সাথে বিয়ে। শ্রীনন্দার মত নিয়েই বিয়ে ঠিক হয়েছে।

সোমদেও-এর মুখে কথাটা শুনে সোমদেওকেও যেন অসহ্য লাগছিল। ওকে একরকম জোর করে বিদায় করে দিয়ে যেন শূন্য হয়ে একলা বসে রইলাম স্টুডিওতে।

সংবাদটা যেন অশরীরী ছায়ার মত ঘুরতে লাগল চোখের সামনে। যেন ওর কোন আকার নেই। সবটাই ভেসে যাওয়া বাষ্পের মত। যেন ঘুম না ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেই কি কথাটি যে শুনেছি, কিছুই যেন মনে আসছে না।

আমাকে বললে না কিছু ! জানালেও না ? একটা কারণও দেখালে না ?

প্রশ্নগুলি যেন অস্থির হয়ে ঘুরতে লাগল মনের মধ্যে।

স্টুডিয়োতে বসে আছি। পায়ের শব্দে পেছন ফিরে শাড়ির পাড়টা দেখেই বুঝলাম শ্রীনন্দা। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে

নিয়ে পেন্সিলটা চালাতে লাগলাম। স্কেচ থেকে মুখটা না তুলেই জিজ্ঞেস করলাম ওকে: সাঁওতালী মেয়ের স্কেচটা আঁকা শেষ হয়েছে তোমার!

তোমার মত কিনা যে দুদিনেই শেষ হবে!—হেসেই জবাব দিল শ্রীনন্দা।

পেন্সিলটা আমার আরও বেশি করে চলতে শুরু করলো স্কেচের উপর।

অনেকক্ষণ পরেও পেন্সিল থামছে না দেখে শ্রীনন্দাই আবার বললো: সন্ধ্যা হয়ে গেলো এখনো এত আঁকছো! কি এমন?

স্কেচটা আজই শেষ করতে হবে।—মুখটা না তুলেই শ্রীনন্দার কথাটা পালটে দি।

কিছুক্ষণ বসে থেকে শ্রীনন্দা চলে গেলো। মাঝে তিনদিন আসেনি। পরে আবার তেমনি আসতে লাগলো, সাঁওতালী মেয়ের স্কেচটা ফিনিস করার উপলক্ষ্য করে।

শ্রীনন্দা স্টুডিয়োতে এলে তুলি নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখি। ওর স্কেচ নিয়ে এটা-ওটা সাজেস্‌শন দেওয়া ছাড়া।

কি যে আমি করবো কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। ঝড় বইছিল তখন আমার সমস্ত দেহ মনে।

জিজ্ঞেস করবো ওকে? নন্দাই বা বলবে না কেন? বিয়ে করবে তো ও, আমি নই! আর কেনই বা জিজ্ঞেস করতে যাবো,—যার কাছে আমার দাম এইটুকু মাত্র?

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এখনও সব ঠিক হয়নি!

এলোপাতাড়ি প্রশ্নগুলি মনের মধ্যে হাতাহাতি করতে লাগলো।

কিন্তু শ্রীনন্দা তো মুখচোরা মেয়ে নয় যে, এসব কথা আমাকে

বাঁচাবে! আমার কল্পনা আমার জীবন আমার সমস্ত সাধনাই যে আমার আর্ট!

আবার শুরু করলাম স্টুডিয়োর কাজ। মনে হলো যেন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে মনটা।

দিন সাতেক পরের কথা। বসে বসে কাজ করছি। দেখি শ্রীনন্দা আসছে স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে ওর এক বান্ধবী।

রক্তে যেন আগুণ লেগে গেলো আমার। জয় করেও গর্ব মেটে না! এত তৃষ্ণা নারীর! ওর জন্য একটা আর্টিস্ট কেমন মুষড়ে পড়েছে তাই দেখানো চাই বান্ধবীকে। একটু সান্ত্বনা আর দুটো মিঠে কথা শুনিয়ে নিজেকে বিজিত পুরুষের সামনে আরও অমূল্য করে তুলবে শ্রীনন্দা!

মনকে যেন বরফ চাপা দিয়ে ফেললাম। একটুও দুর্বলতা দেখানো নয় আর!

শ্রীনন্দা এলো। বান্ধবীকে নিয়ে বসলো এসে স্টুডিয়োতে। ভেবেছিল, আমার চোখে জল দেখবে। দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনবে আর বান্ধবীর সামনে আমাকে অনেক কবে সান্ত্বনা দেবে।

যেন কিছুই হয়নি আমি এমনি করে গল্প করে গেলাম শ্রীনন্দার বান্ধবীর সঙ্গে। আর্ট নিয়ে একথা সেকথা উঠলো। শ্রীনন্দাব প্রসঙ্গে একবারও গেলাম না। বেশীক্ষণ দেরী না করে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গেলো ওরা দুজনে।

ভেবেছিলাম একটা রাফ স্কেচের মত ছিঁড়ে ফেলে দেবে শ্রীনন্দার কল্পনা। কত ছবি আঁকতে আঁকতে রঙ বেশি হয়ে যায়, ম্যাচ করে না। ছবিটা ফিনিস না করেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নূতন স্কেচ ধরি। শ্রীনন্দাও যেন আমার একটা

আনফিনিস্‌ড্‌ স্কেচ। অনেকগুলি ডিজাইন নিয়ে নিলাম একসঙ্গে। তুলি পেন্সিল ছেড়ে মুখ ওঠাবার যেন একটুও অবসব না থাকে।

কিন্তু আঁকতে আঁকতে কখন যে তুলি থেমে যায়! মনেব তুলি বঙ পোছাতে শুরু কবে অন্য কোন্‌ পটে। যেন সব পট জুড়েই শুধু শ্রীনন্দা। খুব কবে ভাবি, ওব কথা আব ভাববো না। কিন্তু একথা ভাবতে না ভাবতেই দেখি শ্রীনন্দাব সঙ্গে বসে গল্প কবছি।

আমাব মনটাই আমাব কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। এব যেন কোনো বাশ নেই আমাব হাতে। আমিই যেন আর কেউ।

স্টুডিযো না ছেড়ে আব পাবলাম না। কিন্তু যাব কোথায! ট্রেনে যদি চলি, বসে বসে যখন আব সময ফুকবে না শ্রীনন্দা এসে আবাব ভানুমতীব খেলা শুরু কববে মনটাকে নিয়ে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো অলকনন্দা-মন্দাকিনীব কথা। এখানে পায়েব সঙ্গে মনকে এক কবে তবে চলতে হয়। মন যদি না চলে পা তবে বন্ধ। পা চললে এ-পথে মনও বন্দী। আব এত সুন্দব এ-হিমাঞ্চল। এত মূর্তি, এত মন্দিব! এত নদী-পবত, ঝবনা। শ্রীনন্দাব খাঁচা ভেঙ্গে মন কি উডাল না দিয়ে পাববে এখানে। চলে এলাম তাই এই উত্তবাপথে।

ভুললো তোমাব মন? নবম সুবে জিজ্ঞেস কবি সাবথীকে।

শ্রীনন্দাব স্মৃতি জীবন থেকে একেবাবে মুছে ফেলতে পাববো কিনা জানি না। কিন্তু এই মন্দিব আব গিবি-দবী-বনাঞ্চল দেখে দেখে মন আমাব মুগ্ধ হযে গেছে। কি সুন্দব! সুন্দবেব কি অনুপম অভিব্যক্তি। এমনি স্থানে মন্দিব বচনা। শিল্পেব কল্পনা অনুভবেব কোন্‌ অতল স্পর্শ পেলে যে তা সম্ভব। শিল্পী যেন সেদিন এক হযে গিয়েছিলেন তাব শিল্পের সাধনায। যেন সুন্দবেব একটি পরম অনুভূতি এই উত্তবাপথ! এই মূর্তি, মন্দিব, হিমাঙ্কিত গিবিমালা, অশান্ত ঝবনা, তুবন্ত গঙ্গা—সুন্দরেব কি অপূর্ব সমাবেশ!

যেন একটি স্বর্ণকমল সহস্র দলের বিচিত্র সুষমায় মূর্তিমন্ত হয়ে আছে এই উত্তরাপথে একটি মাত্র অনুভূতির অনুপম বৃন্তে।

সারথীর সমস্ত মুখ ভরে যেন চাঁদ উঠেছে। স্নিগ্ধ শান্ত স্বপ্নালু। সত্যিই সারথী শিল্পী !

মুগ্ধ মনটাকে অনুভবের নিঃসীমতা থেকে টেনে এনে আবার বলতে লাগলো সারথী। বিগত-স্মৃতি বিশ্লেষণ আর আত্মজিজ্ঞাসায় পূর্ণ হয়ে উঠলো ওর কথাগুলি।

শ্রীনন্দার কথা ভাবি আমি ! কিন্তু উত্তর দিতে পারিনা। সেদিন স্টুডিওতে উপেক্ষা করে যে অসম্মান করেছি ওকে তাও যেন আজ ফিরে ফিরে আঘাত দিচ্ছে আমাকে। শুধু ভাবি, কেন এমন করলো শ্রীনন্দা ! আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন ওর চোখে জল এসেছে। প্রশ্ন করেছি, উত্তর দেয়নি। স্পর্শে ছিল ওর কী মমতা ! বুঝি, ওর কিছুই অদেয় ছিল না। কিন্তু সবটুকু পেয়েও কেন নিল না সবটুকু ?

আমার ভয় হয়, বুঝি ও সুখী হবে না। কেমন করে ভুলবে ও সেদিনের কথাগুলি।

কিন্তু আমি চাই শ্রীনন্দা সুখী হোক ! স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার ওর পূর্ণ হোক্ ! ও যেন ভুলে যায় আমাকে সম্পূর্ণভাবে ! সব মন্দিরেই আমি এই প্রার্থনা করেছি ওর জন্য।

শ্রীনন্দার জন্য শুভ কামনার বাণী শেষ হতে না হতে আবার সংশয়ের ফোঁড় দিতে লাগলো সারথীর মন।

কিন্তু আমি ভাবি, নারীর এ কি মনস্তত্ব ! ভালবেসে ভালবাসা পেলেই কি শেষ হয়ে যায় ওদের প্রেমের আবেগ ! নারী আকুল হয়ে চায়। কিন্তু যেই পেলো অমনি বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেলো তার সব চাওয়া। যতক্ষণ না সে পাবে উদ্দাম হয়ে উঠবে তার

হৃদয়াবেগ। কিন্তু যেই সে জয় করলো, অমনি মিটে গেলো তার দুরন্ত তিয়াসা। একি অতৃপ্তি, একি অপূর্ণতার অনন্ত বুভুক্ষা নারীর চিরন্তন অনুভূতিতে! বুঝি ওরা কাঁদতেই ভালবাসে, চিরন্তন হয়ে বুঝি চাওয়াই ওদের কামনা। কিছু দাও নারী ছুটবে তোমার পানে। আরো দাও সে চাইবে আরো। কিন্তু যেই নিজেকে উজাড় করে দিলে, আপনি শিথিল হয়ে গেলো তার বাহুবন্ধন। একি আলেয়ার ইন্ধন নিয়ে জন্ম ও পরমস্নুন.র অগ্নিশিখার!

ভুল যেন ওর বুঝতে পেরেছে আত্মবিশ্লেষণের এমনি ভাষায আমার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন বিগত দিনের বিচার করতে লাগলো সারথী।

কোথায় আমি ভুল করেছি জানেন? নিজেকে মুঠো মুঠো কবে সবটুকু আমি উৎসর্গ কবে দিয়েছিলাম ওর কাছে। নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে। আব ওব ফুল দিয়ে ওকে অঞ্জলি দেইনি। দিয়েছি আমাব আর্ট দিয়ে। ওর কল্পনার চেয়েও—তাই কি ভুল করেই না আর্টের কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম ওর প্রতিমাকে! যতদিন আমাকে পায়নি এমন ভাব দেখিয়েছে, যেন আর্টই ওর প্রাণ। যেন আর্টের প্রয়াগে এসে আমাদের দ্বয়ী কল্পনার হয়েছে একান্ত সঙ্গম। কিন্তু যেই ও আমাকে পেলো বুঝি আর্টই হলো ওর বৈবী।

ওরা ভাব চায় ভাবান্তরের জন্য। ফুল চায় নৈবদ্য সাজাবার আয়োজনে। বুঝি কল্পনাকে বাস্তবে অঙ্কুরিত করে আবার কল্পনার নূতন ফুল ফুটানোই ওদের অন্তিম আকুতি। তাই বুঝি হাতে তুলি নিয়েও জিজ্ঞেস করতো নন্দা—প্রদর্শনীর ঐ ছবিটা কত বিক্রি হলো সারথী!

যেন একটা সূক্ষ্ম কৌতুকের আকস্মিক সমাধান হয়ে গেলো

হাত বুলিয়ে দিলেন। যাওয়ার সময় মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—'ভগবানের পথে গেছো, সে পথেই থেকো। আর পিছু ফিরে চেয়োনা!'

কৈলাস-মানস থেকে ফেরার পথে কৈলাসানন্দ শুনেছে যাওয়ার সময় যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় মা তাকিয়েছিলেন ওর পথের দিকে। পাহাড়ী রাস্তাটির বাঁকে কৈলাসানন্দ অদৃশ্য হয়ে গেলে মা নাকি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। এবং প্রায় তিন চার ঘণ্টা এমনিভাবে অচৈতন্য হয়ে ছিলেন। চটিদার সে কথা বলে ফেরার পথে কৈলাসানন্দকে।

মার কথা উঠলেই কৈলাসানন্দ হাত জোড় করে প্রণাম করে। কিন্তু বাড়ী যায় না একবারও।

কৈলাসানন্দের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে শেষবারের মত গেলাম অবধূত মহারাজের ভজনের আসরে।

বাকী আছে সত্যসন্ধের ওখানে যাওয়া। আর মোহনদাসের গুহায় চা খাওয়া।

পরদিন উঠতেই মোহনদাস এসে হাজির।

পাথর ভেঙ্গে অনেকখানি উপরে উঠে গিয়ে তবে মোহনদাসের গুম্ফা। মানে, পাথরের মধ্যে এক খাবলা একটা গর্ত। মাত্র একটা লোক কোনমতে টান হয়ে শুতে পারে। আর বড় জোর তিন চারটে লোক পারে বসতে। এই সাধু মোহনদাসের সাধন ভজনের গুম্ফা।

গুম্ফার ছাদ ও মেঝেটি তকতকে করে চূণ দিয়ে নিকানো। ওরই মধ্যে একটা পাথরের থাকে মোহনদাসের আরাধ্য দেবতার শিলাসন। ছোট্ট একটি নারায়ণের পট। এই ওর দেববিগ্রহ।

একটি গীতা, আরো দুটি হিন্দী স্তোত্রের বই নারায়ণের পটের

পাশে যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছে মোহনদাস। আর পাহাড়ী ফুল ও বনতুলসী দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে ওর ঠাকুরের মূর্তিটিকে।

আসবাবের মধ্যে দুটো কৌপীন। একটা চাদর, দুটো কম্বল। একটা থালা, দুটো গ্লাস। আর কিছু চা চিনির কৌটো। এই সাধু মোহনদাসের সংসার। এবং এই নিরালা গুহাটিতেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় চঞ্চল উৎসুক সাধাসিধে ও মোক্ষকামী এই তরুণটি।

হাত জড়িয়ে ধরলো মোহনদাস। ওর গুম্ফায় ভজন গাইতেই হবে।

শুধু ভজনই নয় কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে শেষ করে তবে বিদায় নিতে হলো মোহনদাসের গুম্ফা থেকে।

ফেরার পথে গেলাম সত্যসন্ধের কাছে। দেখেছি দূর থেকে কিন্তু আলাপ করি নি। বুঝলাম সেও লক্ষ্য করেছে এবং আমার যাওয়ার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

যেতেই বললো: আপনার জন্য একটি কবিতা লিখে রেখেছি।

মিশনারী স্কুলে শেখা ইংরেজী উচ্চারণ সত্যসন্ধের। ভাবে ভিজিয়ে ভিজিয়ে আবৃত্তি করে গেলো স্বরচিত কবিতাটি।

সমস্ত কবিতাটিতে একটি নতুন আস্বাদনের বর্ণনা, একটি নতুন রসের অনুভূতি! সত্যসন্ধের নতুন জীবনের উপলব্ধি!

সন্ন্যাসী হলেও সত্যসন্ধের আসবাবপত্রে এখনো একটু আভিজাত্যের ছাপ রয়ে গেছে। কম্বল চাদরটিও একটু আলাদা। বেশ দামী। বইপত্রও আছে কিছু। অন্য জিনিষও কিছু বেশী।

পূর্ব পরিচয় বা পরিচয়-সূত্রের কোনো দিকেই যেতে চায় না। তবে অন্যদের কাছে শুনেছি সত্যসন্ধ নাকি এক সম্পদশালী

অভিজাত ঘরের ছেলে। দেখেও তাই মনে হয়। চেহারাটি যেমন সুন্দর! আসবার পত্রগুলিও তেমনি দামী। আগের অভ্যাসটা এখনো কিছু রয়ে গেছে। সত্যসন্ধের সমস্ত চোখে মুখে একটা সুস্নিগ্ধ দীপ্তি। ওর কণ্ঠে একটি তদগত ভাবের পরশ পাওয়া যায় সব কথাতেই।

কিছু পোট্‌লা বাধা। প্রশ্ন করায় বললো দিন পনের সত পন্থে গিয়ে থাকবে। ওখানকার নিরালাতে সাধন ভজন করার জন্য।

শুনেছি, সাধুরা ওখানে গিয়ে সাধন ভজন করেন। কিন্তু অভিজাত ঘরের এই তরুণটি ওই হাড়কাপানো শীতে আর শিলা-কঙ্কালময় পাহাড়ের শূন্য শ্মশানে একলা গিয়ে করবে পরমার্থের সাধনা! যেখানে গিয়ে একটা রাত কাটাতেই আমাদের প্রায় প্রাণান্ত হয়ে উঠেছিল!

জিজ্ঞাসার চরম অশান্তি মানুষকে দিয়ে যে কি দুঃসাধ্য কাজই না করিয়ে নিতে পারে!

কাল ফিরে যাব। বিকেলের মধ্যে সবার সঙ্গে দেখা করে নমস্কার করে এলাম। এই কয়দিনে নিঃসংকোচে মিশে গিয়েছিলাম এঁদের অনেকের সঙ্গে। অদ্ভুত নির্ভাবনাময় এঁদের জীবন। প্রয়োজনের কোন বোঝা নেই। যেটুকু আছে, ইচ্ছে হলে তাও ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে পারেন। গুহায় বাস কি দুখানা কাঠ জোড়া দিয়ে একটু কুঠির। ভিক্ষায় আহার। চাওয়া পাওয়ার গ্লানি নেই কোনো। সমস্ত জীবনটাই যেন এঁদের কাছে জল বাতাসের মত স্বচ্ছ সহজ ও নির্মুক্ত।

চাঁদ এলিয়ে পড়েছে নারায়ণ পর্বতের গায়ে। সারা বদ্রীপুরী যেন এক তন্ময় নির্জনতায় নিবিড় হয়ে উঠেছে।

এই প্রশান্ত নীরবতা ভেদ করে শুধু বয়ে চলেছে অলকনন্দার উদ্দাম ধারা। এপারে কেউ নেই। ওপারের পাথরে একটি অচঞ্চল ছায়ামূর্তি। ধ্যানাসীন এক সন্ন্যাসী।

একা বসে আছি অলকনন্দার তীরে। কাল ফিরে যাব। মনে যেন কত প্রশ্নের বন্যা বইতে লাগলো।

কেন এলাম এই মহাতীর্থ পরিক্রমায় ?

কেন এলাম জানি না সেকথা। কি পেলাম তা'ও জানি না। এ-কয়দিন একান্ত হয়ে শুধু দেখলাম প্রকৃতির নিরালা রূপায়ণ। আর উত্তরাপথের অগণিত শিল্পীর ধ্যানোত্তীর্ণ সাধনা।

কিন্তু ওপারের ঐ নিস্পন্দ ছায়া মূর্তিটিকে দেখে দেখে চিরন্তন প্রশ্নটিতে আবার যেন আজ এক নতন অনুভূতি এলো।

জীবনের অভিপ্রায় কি ?

জীবনের অভিপ্রায় জীবনকে গড়ে তোলা। এত যে জানা এই তথ্যটি সেও যেন আজ অজানার অন্ধকারে কেমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো।

মানুষ তো একই। ওপারের ওই ছায়ামূর্তি আর এপারের আমি! রক্তে তো জীবনের একই স্পন্দন। কিন্তু বিপরীত গতির কী বিচিত্র উন্মুখতা!

আমরা যে জীবনকে গড়ি ওরা সে জীবনকেই চায় ভেঙ্গে ফেলতে। আমাদের আগ্রহ আহরণে, ওদের সর্বের বিসর্জনে।

আমরা গড়ি আর গড়ি। প্রগতির বৈজয়ন্তী উড়াই। অজস্র আহরণের সম্ভারে সমৃদ্ধ করে তুলি আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা। আমাদের জীবন ঘিরে চলে বর্ণ ও বর্ণান্তরের নিরন্তর প্রবাহ। যা

আমরা পাই তাই চাই আরো। সারা অন্তর জুড়ে আমাদের অতৃপ্তির অগ্নি-ক্ষুধা।

আর ওরা? মমতার নীড় ভেঙ্গে শুধু গৈরিক নিয়েই ওদের ক্ষান্তি নেই। যে আভরণ নিয়ে মানুষের সমাজে ওদের জন্ম, তার সবটুকুই ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওরা চায় একান্তবোধের শূন্যতায় নিমগ্ন হয়ে যেতে।

একই ঊর্ণনাভের দুটি সন্তান। একজন চায় নীড় গড়ার আকুতিকে নিরঙ্কুরিত করে দিয়ে অস্তিত্বহীনতার নিরালম্ব আধার। আর অন্যের কামনা সেই নীড় গড়ার অনন্ত আবর্তনে স্বপ্ন ও সম্ভারের আমন্ত্রণে বিচিত্র বসুন্ধরার সুবিন্যাস রচনা।

আবার জিজ্ঞেস করি নিজেকে,—জীবনের অভিপ্রায় কি?

জীবনের অভিপ্রায় কথাটি যে এত অর্থহীন এত উদবৃত্ত! ঐ ছায়ামূর্তিটির প্রতিফলনে আজ যেন সব একেবারে নিরাধার হয়ে গেলো।

অজস্র প্রশ্ন উঠলো মনে। মানুষের অন্তিম পরিচয় কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? কি আশায় আর কিসের জন্য কোন্‌দিকেই বা চলেছে মানুষের অবিশ্রান্ত ইতিহাস?

আমাদের নিত্য নূতন রূপান্তর করে চলেছি আমরা। বেশ ও ভূষণের বদল করছি। নূতন রুচি ও রসনার সম্ভারে আমাদের মানসিকতাকে নিত্য নূতন করে গড়ে তুলছি। আমাদের আদি-বৃত্তিকে কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও বিস্তৃত কোথাও বর্ণান্তরের ছটায় বিচিত্র করে মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে মগ্ন হয়েছি। জীবনকেই জীবনের ধর্ম করে তুলেছি আমরা। জীবনই আমাদের জীবন-সন্ধানের নিয়ামক—আমাদের মানব ইতিহাসের অভিপ্রায়।

আমার কাছেই আমি যেন আজ নূতন হয়ে উঠলাম। যেন

কোন্ অজানা এক পথিক! প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠছে মনে। আমি কে? কি এই সংস্কৃতি? এই সভ্যতাই বা কি? জীবনের লক্ষ্য বা কি আমাদের?

এমন কথাতো ভাবিনি কোনদিন! জীবনের নহবতখানায় শুধু শুনেছি আমরা আবাহনের সঙ্গীত। তোরণে তোরণে দেখেছি শুধু বর্ণ ও সজ্জার রূপান্তর। অজস্র স্বাচ্ছন্দ্যেব সন্ধানে সঞ্চিত করেছি সহস্র সমৃদ্ধি। আব মনে মনে গর্বিত হয়েছি এই ভেবে যে মানব সভ্যতার অভিযাত্রায় চলেছে প্রগতির নিবন্তব প্রবাহ।

কিন্তু সভ্যতার ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র সমারোহে যে নিত্য নূতন বিবর্তন ঘটছে তাতে কি মানুষেরও ঘটছে কোনো প্রকৃত রূপান্তর? তার সুখদুঃখের মূল অনুভূতিতে—জীবনাকুতিব অতৃপ্ত ক্ষুধায় কি এসেছে কোনো মৌলিক পাববর্তন?

সেদিনের আমি আমিই আছি। মনের গহ্বরে তেমনি আগুন, অনন্ত ক্ষুধার তেমনি অশান্তি। তেমনি নয়া ইন্ধনের সন্ধান কামনায় উদগ্র অতৃপ্তি। বাইরের আবরণ আর আভরণে শুধু ঘটছে বর্ণান্তর। তাই আমাদের কাছে গৌরব পেয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিত্যনূতন জয়যাত্রা বলে।

কিন্তু সুখদুঃখের অনুভূতি আজিও দোলা দিয়ে যায় তেমনি অনন্ত তাড়নায় যেমন দিয়েছে সেদিনের আদিম গুহা-মানবকে।

আবাব প্রশ্ন জাগে মনে। তবে মানুষের, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই বা মূল্য কি? যুগে যুগান্তবে জীবনের এই অন্ধ ও অশান্ত বিসরণের পরিণাম কি?

পরিণাম কথাটা যেন বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে গেলো মনের আঙ্গিনায়। যেন কি দুর্বোধ্য এই পরিণাম কথাটি।

পরিণামের অর্থ কি অস্তিমের একটি অনন্ত বিচ্ছেদ? একটি চিরস্থির অস্তিত্ব? নয়তো অস্তিত্বের নিঃশেষে একান্ত শূন্যতা?

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করলাম পরিণাম কথাটির তাৎপর্য।

কিন্তু যার পরিণাম আছে প্রারম্ভও আছে তার। কিন্তু কার প্রারম্ভ? 'কারই' যদি প্রারম্ভ হলো, তবে তা প্রারম্ভ হলো কি করে?

যা একের প্রারম্ভ তাই কি অন্যের সমাপ্তি নয়? সূচনা ও শেষ কি একই গতির—একই অনুভূতির দুটি সীমায়িত বিন্দু-চিহ্ন নয়?

সূচনা ও সমাপ্তি, প্রারম্ভ ও পরিণাম—কথা দুটি যেন বলয়ের মত ঘুরতে লাগলো মনের আঙ্গিনায়।

জীব-বিবর্তনের ধারায় আমরা মানুষ হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমার জীবাঙ্কুরের আগে কি ছিল?—শুধু পদার্থময় পৃথিবী? তার আগে?—শুধু বাষ্পময় নিহারিকা? তার আগে?—তেজময় প্রবাহ মাত্র? কিন্তু তেজপ্রবাহ এলো কোথা থেকে?

আর কোনো উত্তর নেই এর।

আবার সামনের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি বাড়াই।

নিরবচ্ছিন্ন সমাপ্তি বা সম্ভাবনার পরিপূর্ণতা বলে কিছু আছে কি? 'শেষ' বলতেও তো তেমনি মনে হয় 'কার' শেষ? 'কিছু নেই'—অনন্ত শূন্যের এমনি একটি কল্পনা কি আঁকা যায় মনের অনুভূতিতে? শূন্যের কল্পনাও তো আপেক্ষিক শূন্যের ধারণামাত্র—একান্ত শূন্যের নয়। কার শূন্যতা? 'কার' না হলে তো শূন্যতাও অর্থহীন।

আগের দিকে বা পিছের চাই, কি তাকাই ইতিহাসের দিকে—সূচনা ও সমাপ্তি, আদি ও অন্ত অন্তিমার্থে যেন একই কল্পনার একটি দুজ্ঞেয় সংকেতে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। আদি না থাকলে অন্ত নেই। অন্ত না থাকলে আদিও নেই। কিন্তু আদি ও অন্ত একান্ত হলে দুটোই আবার অর্থহীন।

তবে ? একটা নির্বোধ অনুভূতিতে সমস্ত কল্পনার ইন্ধন যেন নিরাকার হয়ে গেলো।

বসে আছি অন্ধকারে। অলকনন্দার রুদ্র গর্জনও যেন কখন নিস্পন্দ হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু কঠিন পাথরের কালো ছায়া।

মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা আজ যেন আকস্মিক চোখের সামনে নিরালম্ব হয়ে গেলো। কি এব অন্তিম মূল্যমান ? নিজেদের আপেক্ষিক অনুভূতির কি অবোধ সৃষ্টি নই আমরা ? আমাদের মূল্য তো আমাদেরই কল্পনার বৃন্তে এক একটি স্বরচিত্ কুসুম মাত্র ! আর এই আপেক্ষিকতার ইন্ধনেই নিরন্তর চলছে আমাদের আবর্তন ও বর্ণান্তরেব বৈচিত্র্যায়ণ। এই আপেক্ষিকতার আগ্রহেই আমাদের মূল্য—আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতার অন্তিম পরিচয় !

অন্তিমার্থহীন সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ছেড়ে মন আবার ডুব দিলো অন্তিমের স্বরূপ সন্ধানে।

আদি-অন্তের কল্পনাই যদি হয় অর্থহীন তবে তো অন্তিমের স্বরূপও অন্তিম কল্পনায় অস্তিত্বহীন !

তবে কি এই কল্পনার জন্যই অন্তিম স্বরূপের নাম দেওয়া হয়েছে অনির্বচনীয় ? এই অনির্বচনীয়ের কল্পনাই কি তবে ভগবানের কল্পনা ?

মনেব ঢেউ আবার উদ্দাম হয়ে উঠলো।

অনিবচনীয়ই যদি হয় অন্তিম সত্বা, তা হলে সমস্ত কিছুর আদি উৎসও এই অনির্বচনীয় স্বরূপ ! যার অস্তিত্ব থেকে সমস্ত পদার্থময় অস্তিত্বেরও উদ্ভব ! যা আমাদের এই পুঞ্জ পুঞ্জ কণাতরঙ্গময় বিশ্বকে করেছে রচনা, পদার্থের মধ্যে দিয়েছে প্রাণাবেগের স্পন্দন !

কিন্তু এই অনির্বচনীয় সত্বা খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নরূপে নির্বচনীয় হয়ে

বিচিত্রিত হলো কি করে? আদি-অন্তের বন্ধনে ধরা দিয়ে অনির্বচনীয় কি নিজেই নিজের প্রকৃতিকে তবে অস্বীকার করলো না?

সমস্ত ভাবনাটি যেন ভূমিকম্পের মত দুলতে লাগল। জীবন ও জগতের অর্থ-বিচারে সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলো। উল্কার মত মনের আকাশে শত শত প্রশ্ন যেন দিগ্‌বিদিক হারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

ভগবানের অর্থ কি? এই বিশ্বের সঙ্গে, এই জীবনধারার সঙ্গে ভগবানের সংযোগ কি? কেন এই জ্যোতিষ্কলোক! কেন পৃথিবী! কেন প্রাণী! কেন মানুষ! কেন এই পুঞ্জ পুঞ্জ কণা-তরঙ্গের বিচ্ছিন্ন সত্বার বিচিত্র কল্পনা! কেন তুমি, কেন আমি! একান্তের কেন এই অজস্র রূপায়ণ! কেন অসমতার আমন্ত্রণে সুখ-দুঃখের এই বিচিত্র অনুভূতি! কেন তৃপ্তি ও ক্ষুধার অনন্ত আকুতির অগ্নিশিখায় জীবন প্রবাহের এই নিরন্তর আবর্তন!...

প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জর করে দাও নিজেকে। জর্জর করে দাও সেই অনির্বচনীয় সত্বাকে! কল্পনার কল্পনাকে নিঙড়ে নিঙড়ে নিঃশেষ করে দাও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মতম বিচার বিশ্লেষণে! কিন্তু উত্তর পাবে না কোনো!

বড়জোর অলকনন্দার ওপারের ছায়ামূর্তিটি এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলবে—এ কিছু নয়! ও কিছু নয়! সবই মানব কল্পনার বিভ্রান্তিমাত্র। এই অনুভূতিময় বিশ্ব,—বিশ্বের এই বিচিত্র রূপায়ণ, —সবই অনির্বচনীয় ভগবানের এক অনন্ত লীলা মাত্র। আছেও, নেইও—এই কি সেই অনির্বচনীয়ের লীলা।

যদি উত্তপ্ত হয়ে প্রশ্ন করো,—লীলা কি? কেনইবা এই লীলা?

ঐ ছায়ামূর্তির কাছ থেকে স্মিতকণ্ঠের উত্তর পাবে,—বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে সে কারণের সন্ধানও মিলে না, অনুভবও সম্ভব নয়। এই-ই মানুষের সসীমতা।

অশান্ত ঝড় আরো অশান্ত হয়ে উঠলো। মনের তটে উঠলো শুধু অসমাপ্ত জিজ্ঞাসার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ।

এই সেই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ! আর এরই নাম দিয়েছি আমরা ভগবান! এই ভগবানকেই বলি আমরা করুণাময়! এরই নামে নিজেদের করি নিবেদন!

এই অনির্বচনীয়ই যদি ভগবান, কি প্রয়োজন তবে আমার সেই নির্মম নির্বিকার ভগবানকে দিয়ে?

তুমি আমাকে বোধ দিয়েছো, বুদ্ধি দিয়েছো। দিয়েছো আমায় কল্পনার পাখা মেলে অশান্ত বিসরণের অনন্ত আকুতি। দিয়েছো আমায় অস্তিত্বের অনুভব। তবু দাওনি আমায় অন্তিম স্বরূপের উপলব্ধি! দাও নি তোমার অভিপ্রায়ের সন্ধান! তুমি আমাকে যে বোধ দিয়েছো তা দিয়ে না জানা যায় তোমাকে, না জানা যায় আমাকে! না অনুধাবন করা যায় তোমার বিশ্ব-রচনার এই বিচিত্র ধারা!

তবু আমরা ছুটে চলেছি দুর্ণিবার অতৃপ্তির অনন্ত বুভুক্ষা নিয়ে। জানি না জীবন প্রবাহের কি উদ্দেশ্য, কি এর মূল্য! শত আর্তনাদে মাথাকুটে মরলেও আমাদের বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে পাব না এর কোনো সন্ধান। তবুও প্রগতি সাধনের অন্ধ তাড়নায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নামে ছুটে চলেছি আমরা সীমাহীন, সময়হীন, পরিণামহীন এক অনির্দ্দেশ্যের সন্ধানে।

জীবন নিয়ে একি পরিহাস জীবন-দেবতার!

সারা চিত্ত ভরে শুধু যেন বিক্ষোভের মন্থন! কি প্রয়োজন

তবে আমার ভগবানকে দিয়ে—যে আমায় বন্ধ্যা করেও দিয়েছে অনন্ত বুভুক্ষা!

ওপারের ছায়ামূর্ত্তি তেমনি অচঞ্চল। অলকনন্দা তেমনি বইছে ক্লান্তিহীন প্রবাহে। শুধু সন্ধ্যার শুকতারাটি আবার বুঝি ঘুরে এলো পুব আকাশের দিগাঙ্গনে।

মনের অনুভূতিটি যেন নিস্পন্দ হয়ে গেছে। যেন অঙ্কের শূন্য হয়ে গেছি আমি। শূন্যকে নিয়েই আর সবের মূল্য। কিন্তু শূন্যের নিজের কোনো মূল্য নেই। আমিই জীবনের আশ্রয় কিন্তু আমারই নেই কোনো নিজস্ব মূল্য। যেন শূন্যের মতই নির্বোধ ও নিষ্ক্রিয় আমার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র পরিচয়।

কতক্ষণ বসে আছি জানিনা! সময়ও যেন নিশ্চল হয়ে গেছে! সুখতারাটি শুধু উঠছে ধীরে ধীরে। স্মিত স্নিগ্ধতায় পূর্ণ হয়ে উঠছে অলকনন্দার দিগাঙ্গনে। পশ্চিমে অস্ত গিয়েছিল আবার উঠলো এসে পুব আকাশে। একই পথের পুনরানুবর্তন।

আবার মনের তটে ফিরে এল মূল প্রশ্নটি। যেন একটি সকরুণ সঙ্গীতের আকুল আবেদনের মত।

যদি দুর্জ্ঞেয় না হয়ে পরিচয়ের সুতীক্ষ্ণ প্রভায় বিশ্বসত্বার সমস্ত অস্তিত্বটাই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো! যদি জীবন ও জীবনদেবতার কার্য্য-কারণ হতো জ্যামিতিক আঁকের মত সুনির্দিষ্ট! জন্ম-মৃত্যুর কাল পরিক্রমার আগেই যদি জানা থাকতো জীবনাবর্তনে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা! যদি আমার কাছে আমি হতাম জীবনযাত্রার নিখুঁত একটি চিত্রপট?

অনির্দেশ্য নেই, অজানা নেই, অনিশ্চয়তা নেই—সমস্ত অস্তিত্বই যদি হতো সুনিশ্চিত জানার চিহ্নাঙ্কিত একটি অতিকায় মানচিত্র?

যদি জীবনের সাথে জীবনদেবতার সেতুবন্ধন হতো রাজপথের মত সর্বজনীন? পরিচয়ই যদি হতো সমস্ত প্রকাশের সুস্পষ্ট নির্ণয়?

তবে ...তা হলে?...এমনি একটি নিত্যকালের পরিচয়ে?...

শিউরে উঠলাম এমন একটি 'আমি'র কল্পনা করে!

সুনিশ্চিত দেখাজানার কারাগারে আবদ্ধ একটি স্থবির মানব। সবই পরিচিত, সবই সুনির্দিষ্ট। সব কিছুই সসীম। সব কিছুই পরিমন্ত। অসাম্য নেই, অশান্তি নেই, অজানার সমুদ্রে নেই অনন্ত মন্থন। নেই ভাবনা, নেই কল্পনা। জীবনে নেই সহস্র শতদলের পল্লবমোচন। না আগ্রহ, না আকুতি। না অনুভূতি, না সৃজন। সব কিছুই যদি হতো সব কিছুর চিরস্থির দর্পণ মাত্র!

তা' হলে?......

না না না! না সে জীবন, না সে জীবনদেবতা! সে জীবন যে হতো চির-মৃত্যুর এক অনন্ত কঙ্কাল! যান্ত্রিকতার এক মর্মান্তিক জড়তা! স্থবিরতার এক বিকট প্রদর্শনী!

যেন ডোবা চাঁদ আবার উঠলো নারায়ণ পর্বতের গায়ে। মমতার মৃদুস্পর্শে যেন ছড়িয়ে দিল সুস্নিগ্ধ আভা। অলকনন্দার ক্ষীপ্র ধারায়ও যেন শুরু হলো জলতরঙ্গের সুমধুর সুরঝঙ্কার।

জীবন অজানা ও অনন্ত বলেই না জীবনদেবতা এত প্রিয়! ভগবান অনির্বচনীয় বলেই না মানব কল্পনার অতলান্ত উৎস!

অন্তহীন অনির্দেশ্যের সন্ধানেই তো সৃষ্টির আনন্দ—জীবনের কূলাকূলহীন অভিযাত্রা! জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সীমাহীন অবসর আছে বলেই তো জীবন এত মধুর এত প্রিয় এত নিরন্তর! জীবন অজানা ও অসীম বলেই তো আনন্দের এমন অনন্ত আবেদন!

তোমার সাথে আমার সুপরিচয়ের চেনা-জানা নাই বা হলো!

ওই ছায়ামূর্তির মত বোধ ও বুদ্ধির অস্তিমে তোমার মাঝে আমায় ডুবিয়ে দিয়ে নাই বা পেলাম তোমার একান্ত পরিচয়! নাই বা বিসর্জন দিলাম আমার বিচ্ছিন্ন সত্বার স্বতন্ত্র অনুভূতিটুকু!

আমি আছি, তুমিও আছো! অজানার সেতুবন্ধনেই তুমি সুমধুর করে তুলেছো আমার জীবনাবেগ! অসীম অনন্তে অনির্বচনীয় বলেই তো তুমি চির-সুন্দর! চির-আনন্দময়! তোমায় পাইনে বলেই তো, পাওয়ার জন্য এত আকুতি। তোমায় জানিনে বলেই তো জানার জন্যে এমন অতৃপ্ত তৃষ্ণা! হে আমার প্রিয়! হে আমার জীবন-দেবতা! তোমাতে আমাতে অনন্ত বিরহের বেদনা দিয়েই তুমি আমায় একান্ত করে নিয়েছো! তোমার অনুরাগের অমৃত-সাগরে আপনাকে উৎসর্গ দিয়েই তো হবে তোমার মাঝে আমার পরম মিলন! তুমি অজানা! তুমি অসীম! তুমি অনির্বচনীয়! তাই তুমি আমার স্মরণীয়, বরণীয়! আমার সমস্ত অনুভূতির তুমি এমন সর্বোত্তম উপলব্ধি!

ফিরে চলো এবার পথিক!

